ধর্মের দেয়াল

– এস.ই জামিন স্বর্ণা

এয়ারপোর্টে কাস্টমসের যাবতীয় ঝামেলা শেষে যখন বাইরে বের হলাম তখন দেখি মাথার ওপর ধবধবে আকাশ আমাদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। হালকা রোদ আর মিষ্টি হিমেল হাওয়ায় মনে হলো ঘণ্টা খানেক হেটে বেড়াই। কিন্তু সামনেই দাড়িয়ে আছে কম্পানি থেকে পাঠানো মিনিবাস। অগত্যা গাড়িতে উঠে জানালার ধারে বসলাম। জানালার কাচ সামান্য সরিয়ে বাইরে চোখ রাখলাম। যতোদূর দেখা যায় দেখতে লাগলাম আপন মনে।

এই প্রথম দেশের বাইরে আসা। তাও আবার একা। কম্পানির যাবতীয় খরচে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের আরো কয়েকটা দেশ থেকে প্রায় পচিশজন এসেছি এক মাসের স্পেশাল ট্রেনিংয়ে। পুরো এক মাস সবাইকে ছেড়ে থাকতে হবে ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এক্সকিউজ মি। অপরিচিত কণ্ঠের ডাকে পাশ ফিরলাম।

মে আই হ্যাভ দি সিট? সম্মতি জানাতেই ছেলেটি পাশে বসলো। আর বললো, আমি রিচার্ড হপকিন্স, বতসোয়ানা থেকে।

ভদ্রতা সূচক একটা ছোট্ট হাসিসহ নিজের নাম ও দেশ জানালাম। তারপর আবার বাইরে চেয়ে থাকলাম। বাস চলছে, সেই সঙ্গে হালকা দুলুনিতে ঘুম ভাবটা গাঢ় হতে লাগলো। প্রিয় রঙয়ের সানগ্লাসটা চোখে থাকায় ঘুমাতে অসুবিধা হলো না।

হোটেলে পৌছে ফ্রেশ হয়ে হলরুমে গেলাম। অন্যদের সঙ্গে আলাপ ও নাশতা পর্ব শেষে রুমে ফিরলাম। বিকেলে কম্পানি থেকে শহর দেখানোর প্রোগ্রাম। গাড়িতে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পৃথিবী বিখ্যাত দেশ ও দূষণমুক্ত শহর দেখে বার বার পুলকিত ও আনন্দিত হচ্ছি। বাস থেকে নেমে উচু পাহাড়ের বুকে হাটতে গিয়ে মনে হলো যেন ওই দূরে দিগন্ত এসে মিশে গেছে মাটিতে। হাত বাড়ালেই হয়তো ছোয়া যাবে আকাশ, মেঘ।

এতো সুন্দর প্রকৃতি। তো সানগ্লাস চোখে ঠিকমতো অনুভব করতে পারবেন না।

ও আপনি!

আপনাকে একা দেখেই এলাম।

সানগ্লাসটা খুলে জানতে চাইলাম, কেন?

শুনেছি আপনাদের দেশটা খুব ছোট ও অনুন্নত। কিন্তু সেখানকার মানুষদের মনটা বিশাল। দেশের জন্য সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ, সাধনা, বিশেষ করে ১৯৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা আজও আমার কাছে আশ্চর্যের।

একজন বিদেশির মুখে নিজ দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি এ ধরনের শ্রদ্ধায় নিজেকে খুব গর্বিত মনে হলো। সেই সঙ্গে রিচার্ড–কেও বন্ধু ভাবতে দ্বিধা হলো না। ট্রেনিং ক্লাসে পাশে বসা থেকে শুরু করে সারাটা দিন রিচার্ডের সঙ্গেই কাটতো। পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে দুজনে আলোচনা করতাম। আমাদের দেশ, মানুষ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদিতে তার খুব আগ্রহ ছিল। আমিও সানন্দে তাকে সব কিছু বলতাম। কখনো বা আমার প্রিয় লেখক সমরেশ, শীর্ষেন্দু, শরৎচন্দ্র, সুচিত্রা ভট্টাচার্য প্রমুখ লেখকদের গল্পের সারমর্ম অনুবাদ করে শোনাতাম। সে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো চুপচাপ শুনতো আর মাঝে মধ্যে প্রশ্ন করতো।

এভাবে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। ট্রেনিংয়ের শেষ পর্যায়ে পৌছালাম। আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, রাতের মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদে বাকিটা সময় এক সঙ্গে কাটাতাম।

ট্রেনিং শেষ হলো।

হঠাৎ একদিন রিচার্ড বললো, আর যে কয়েকটা ঘণ্টা আমরা পাবো সে সময়টা তুমি তোমার গ্লাসটা চোখে রেখে দিও।

আমি কপট বিস্ময়ে জানতে চাইলাম, কেন?

সে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, ওই চোখ দুটো দেখলে তোমাকে নতুন করে কাছে পেতে ইচ্ছা করবে। তোমার সঙ্গে জীবনের বাকিটা পথ কাটাতে ইচ্ছে করবে। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তার উত্তেজনা এবং এই ধরনের স্বীকারোক্তিতে আমার ভেতরটা চুরমার হতে লাগলো। কারণ আমিও তাকে ভালোবেসেছি আগেই। কিন্তু জানানোর সাহসটুকু হয়নি। আমি গোড়া মুসলিম পরিবারের মেয়ে। একটা অন্য ধর্মের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া তো দূরের কথা, সম্পর্ক আছে এটা বুঝতেই তাদের এক যুগ পেরিয়ে যাবে।

রাতে অনেক ভাবলাম। না, মা-বাবা আত্মীয়, সমাজ কোনো কিছুই ছাড়তে পারবো না। মাত্র এক মাসের সম্পর্ক পাওয়ার জন্য আমি তেইশ বছরের সম্পর্কগুলো হারাতে পারবো না। সারা রাত দুই চোখের পাতা এক সেকেন্ডের জন্যও এক করতে পারলাম না। এমন মানুষকে ভালোবাসলাম যাকে পাবো না শুধু দুজন দুই ধর্মের বলেই!

সকালে তাকে সিদ্ধান্তটা জানালাম ফোনে। দুপুরে আমার ফ্লাইট। চুপচাপ রুমে বসে থাকলাম আর কাদলাম। বাসে পাশাপাশি বসে এয়ারপোর্টে পৌছালাম। আমার এক ঘণ্টা পর তার ফ্লাইট। এতোটা পথ আমাদের কোনো কথা হয়নি।

অন্যদের কাছে বিদায় নিয়ে তার মুখোমুখি দাড়ালাম। রিচার্ড নিচু মুখে দাড়িয়ে।

বললাম, শেষ বার আমার চোখ দেখবে না? শেষবারের মতো আমাকে দেখবে না?

কিছু সময় নীরবতায় কাটলো দুজনের। তারপর সে হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে শুধু বললো, ভালো থেকো চিরকাল।

অশ্রু লুকাতে আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম তার সামনে থেকে। তার জীবন থেকে। আমাদের রেখে যাওয়া স্মৃতি থেকে।

মেঘের ভেতর অচেনা পথ বেয়ে প্লেন চলছে। প্যাকেটটা খুললাম। চামড়ার বক্সটার ভেতর খুব সুন্দর একটা সানগ্লাস। সঙ্গে ছোট্ট এক টুকরো কাগজে লেখা –

যে চোখে অশ্রু মানায় না, তাকে
ঢেকে রেখো একটু কাচের আড়ালে।

sharnazamin@yahoo.com

ব্রা

– জাফর আহমদ আকাশ

আমি যখন ক্লাস টেনে পড়ি তখন আমাদের বাংলা ক্লাস নিতেন মজুমদারস্যার। স্যার খুব সুন্দর করে পড়াতেন ও বোঝাতেন, শুধু তাই নয়, তিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আমাদের বলতেন, একদিন সবাই বিয়ে-শাদি করবি, ছেলেমেয়ের বাবা হবি, একটা কথা আমার মনে রাখিস, সেই সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সুন্দর করে কথা বলবি। এতে করে তারা সুন্দরকে গ্রহণ করতে শিখবে এবং সুন্দর করে কথা বলার জন্য ছেলেমেয়েরা উৎসাহিত হবে।

আজ সংসার জীবনে এসে স্যারের সেই মূল্যবান বাণীটি উপলব্ধি করছি।

ছোট মেয়ে রিয়ার সামনে আমার স্ত্রী লিজা কখনো ব্রা বলতো না। ব্রা-র প্রয়োজন হলে বলতো রিয়ার আব্বু, আজকে পারলে দুই তিনটা চশমা নিয়ে এসো।

এই কয়দিন আগে তোমাকে দুটো চশমা কিনে দিলাম, তা কোথায়?

তুমি এতো খবরদারী করো কেন, সেগুলো ছিড়ে গেছে। তোমাকে চশমা আনতে বললাম, পারলে এনো।

কিছু দিন পর ঘটলো মূল ঘটনা। এক অনুষ্ঠানে যাবো। মা, খালাতো ভাই-ভাবী, খালাতো বোন, খালাম্মা বসে আছেন রুমে। লিজা কি যেন খোজাখুজি করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি খুজছো? এমনিতে দেরি হয়ে গেল, বের হতে হবে না?

লিজা বললো, আমি তো আমার চশমা খুজছি।

এই কথা শোনামাত্র আমার চার বছরের মেয়ে রিয়া ওয়ারড্রব খুলে একটি কালো রঙয়ের ব্রা এক হাতে ঝুলিয়ে সবার সামনে এনে বললো, আম্মু, এই নাও তোমার নতুন চশমা।

সেদিন আমি আর লিজা সবার সামনে যে লজ্জা পেয়েছি তা লিখে বোঝাতে পারবো না।

অথচ লিজা *চশমা* পরেই ছিল।

ঢাকা থেকে

ফুটো

– আসিফ কাজল

বছর কয়েক আগে দাদি মারা গেলেন হঠাৎ করেই। একদিন ভোরে দাদির ঘরের খুটখাট আওয়াজ না পেয়ে আম্মা উকি মারতেই চিৎকার দিয়ে বসে পড়েন। আমরা গিয়ে দেখি দাদি রাতেই ঘুমের ঘোরে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছেন।

কয়েকদিন শোক পালন শেষে দাদির ঘর দখলের প্রশ্ন এলো। পারিবারিক মিটিং শেষে ছোট ভাই রুমটা জিতে নেয়।

দাদির ব্যবহৃত জিনিসপত্র সরানোর সময় তার পালংকের নিচে একটা তোরঙ্গ খুজে পাই। বাবা খুললেন তোরঙ্গটা। ভেতরে দাদির হাজারো স্মৃতি বিজড়িত সব হাবিজাবি জিনিসপত্র। এর ভেতর থেকে হঠাৎ একটা চশমা বের হলো। পুরনোর ধাচের চশমা, পুরু লেন্স বিশিষ্ট কালো ফ্রেমের চশমা। চশমার বাম কাচটা ছোট শক্তিশালী কোনো কিছুর আঘাতে ফুটো হয়ে গেছে। চারপাশের কাচটাও চাপ চাপভাবে ফাটা। চশমাটা আব্বা হাতে নিয়েই ছোট চাচার (সাঈদ) নাম ধরে বিলাপ করতে লাগলেন। আম্মার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি তার অশ্রু লুকোনোর ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

দুপুরে বাবা আহার করতে করতে বললেন, চশমাটা তোর ছোট চাচা সাঈদের। ১৯৭১-এর গণ্ডগোলের সময় আমরা বগুড়ায় থাকতাম। একদিন রাতে তোদের দাদির পেটে ব্যথার ওষুধ আনতে সাঈদ ফাসিতলা বাজারে যায়। সাঈদ আর ফিরে আসেনি। তোদের দাদি শুধু তার কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে থাকেন, কেন সাঈদকে ওষুধ আনতে যেতে বললাম। তার বিলাপে বাতাস ভারী হয়ে যায়।

ভোরের আজানের সময় পাশের বাড়ির হারুনচাচা এসে আমাকে আড়ালে ডেকে বলেন যে, সাঈদকে মিলিটারিরা ধরে ফাসিতলা বাজারে অনেকের সঙ্গে ব্রাশফায়ার করেছে। তোদের দাদি আড়াল থেকে সব শুনে একাই পালিয়ে সেই বাজারে যান। ততোক্ষণে মিলিটারিরা লাশ গণকবর দিয়ে দিয়েছে। তোদের দাদি এই ফুটো চশমা আর তার পাশে পড়ে থাকা ওষুধ কুড়িয়ে ফিরে এলেন কাদতে কাদতে।

পরে সেই ব্রাশফায়ার থেকে অলৌকিকভাবে বেচে যাওয়া জব্বার মাষ্টারের ছেলে ফরিদের কাছ থেকে সাঈদকে মারার কাহিনী জেনেছিলাম। সাঈদের চোখে জন্মগত ত্রুটি থাকার কারণে ছোটবেলা থেকেই পুরু লেন্সের চশমা পরতেন। সাঈদকে মিলিটারি ধরার পর সাঈদ পাক মিলিটারি অফিসারের পায়ে ধরে আকুতি জানাতে থাকে যে, মায়ের ওষুধ দিয়েই ও আবার ফিরে আসবে। তাতেও অফিসারের মন টলেনি। বরং বার বার অনুরোধ জানানোর কারণে অফিসারটি রেগে গিয়ে পিস্তলের নল সাঈদের বাম চোখের চশমার ওপর ঠেকিয়ে গুলি করে। সাঈদ সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। লাশ টেনে নেয়ার সময় চশমাটা খুলে পড়ে যায় সাঈদের চোখ থেকে।

আমার দাদি এই ফুটো চশমা ত্রিশ বছর আগলে রাখেন। মাঝে মধ্যে দোর আটকিয়ে শুকনো কালো রক্তওয়ালা চশমাটা জড়িয়ে কাদতেন। আমরা ভাই-বোন এগুলো কিছুই বুঝতাম না । দাদি মারা যাওয়ার পর বাবা আমাদের এগুলো বলেছিলেন।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

রূপালি ফ্রেম

– নিজাম মুহাম্মদ

খুব সকালে মৌলভীবাজারগামী একটি বাসে চেপে বসলাম। সব সময় জানালার ধারের সিট আমার পছন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, সেদিন জানালার ধারের কোনো সিটই পাইনি। ডাবল সিটের ভেতর পাশের সিটে আমি বসেছিলাম।

আমার ডান পাশে লোক চলাচলের ফাকা জায়গাটুকুর ওপারেই এক অপরূপা সুন্দরী মেয়ে সমস্ত বাস আলোকিত করে বসেছিল। মেয়েটার গায়ের রঙ ফর্শা। চোখ দুটি আয়ত এবং গভীর স্বচ্ছ জলের কূয়োর প্রতিবিম্বের মতো। তার চোখে রূপালি রঙের চশমা। মনে হলো পৃথিবীর রূপালি রঙের সব চশমা যেন এই মেয়েটির জন্য তৈরি হয়েছে। মেয়েটিই যেন রূপালি চশমার আবিষ্কারক। তাকেই যেন রূপালি চশমায় মানায় আর চোখের ওপরের ঘন-কালো ভ্রূ তার ফর্শা মুখশ্রীর ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছে।

তার দুই কানে সোনার দুখানা ঝোলা দুল ঝলমল করছে। তার কমলার কোয়ার মতো পাতলা অথচ নিভাজ ঠোঁট দুটি যেন প্রথমেই বুকের ভেতরে রক্ত জমিয়ে দেয়। তার মুখে বাড়াবাড়ি রকমের প্রসাধনীর প্রয়োজনই বোধ করেনি সে। প্রকৃতি যাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দেয়, নিজের মেয়ের মতো, রূপ চর্চার তাদের বাড়াবাড়ি কখনো প্রকৃতি ক্ষমা করে না। মেয়েটি বোধহয় কোনোভাবে রহস্যটা জেনে গিয়েছিল বলেই মুখে এনামেল পেইন্ট মাখেনি।

জানালার ধারে সিট না পাওয়ার যে খচখচানি ছিল তা মেয়েটির কাছে বসে যাবার সুযোগ পেয়ে উবে গেল। দুজন বসার সিটে অন্য যেজন বসেছিলেন, বোধহয় মেয়েটির মা। আমি লক্ষ্য করছিলাম তাদের সঙ্গে কোনো পুরুষ লোক নেই। যে বয়স্ক ভদ্রলোক (সম্ভবত মেয়েটার বাবা) বলছিলেন, জেসমিন, বাড়ি গিয়ে পৌছেই ফোন করবি।

আমার চোখ বার বার চলে যাচ্ছিল মেয়েটার দিকে।

জেসমিন একবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতেই আমাদের দুইজোড়া অচেনা চোখের ঠোকাটুকি হয়ে গেল। বুকের ভেতর কোথায় যেন আকস্মিক দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলাম। আমার সব রক্তের রেণুকার মধ্যে যেন কিসের একটা কানাকানি পড়ে গেল।

বাস ছুটে যাচ্ছিল বিরামহীন একটানা শা শা শব্দে। নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবেন?

জেসমিন বোধহয় বুঝতে পারছিল যে, আমি অভদ্র নই। অন্তত আমার ব্যক্তিত্ব, আমার পোশাক, আমার আচরণ এবং বিনয় পূর্ণ প্রার্থনার মধ্যে সে দোষের কিছু পায়নি। পায়নি বলেই জেসমিন বললো, আমরা মৌলভীবাজার যাবো। আপনি কোথায় যাবেন?

বললাম, আমি কুলাউড়া যাবো। অবশ্য আমার বাড়ি মৌলভীবাজারেই। তা কোন কলেজে পড়াশোনা করছেন?

জেসমিন জানালো, সরকারি কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে।

আমাদের অনেক কথা হলো।

এক সময় বাস এসে গেল মৌলভীবাজারে।

জেসমিন বিদায় নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বাস থেকে নেমে পড়লো।

বাসের সুপারভাইজার মালপত্র নামানোর সময় আমিও সাহায্য করলাম। সব কিছু নিয়ে নিচে নেমে হাফ ছাড়ার পর বাস চলতে শুরু করবে। এই সময় জেসমিনের দিকে চোখ তুলে তাকালাম। কে জানে, আর হয়তো কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না! সেই মুহূর্তে মনে হলো, যদি তার বাড়ির ঠিকানা আলাপের এক ফাকে জেনে নিতাম, কি এমন অভদ্রতা হতো!

আমার ভেতরে প্রবল ইচ্ছা, অথচ বাস ছাড়ার সেই মুহূর্তেও তার মায়ের সামনে, সুপারভাইজারের সামনে ব্যাপারটা খুবই কঠিন হয়ে গেল আমার কাছে। আমার ভেতরে বহুদিনের ঘুমন্ত কি এক অস্থিরতা জেগে উঠছিল ধীরে ধীরে। একই সঙ্গে কি এক সুখকর ও কষ্টকর অনুভূতি। বাস চলতে শুরু করার পর নিজের সিটে এসে বসে খুবই অস্থির লাগলো ভেতরটা। দেখা হবে না, জেসমিনের সঙ্গে আমার আর কোনোদিন দেখা হবে না!

বাস তখন ছুটে চলছে পূর্ণ গতিতে। হঠাৎ বামের সিটের দিকে চোখ আটকে গেল। জেসমিন যে সিটে বসেছিল সে সিটে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি রূপালি ফ্রেমের চশমা।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়িয়ে পেছনে তাকালাম। কিন্তু এখন আর কিছুতেই এখান থেকে ফিরে গিয়ে তাদেরকে পাওয়া সম্ভব নয়।

মৌলভীবাজার থেকে

নাকে বসে ধরে কান

– শিপন

আমি দশ বছরেরও বেশি সময় এই চশমা ব্যবসার সঙ্গে কম বেশি জড়িত। তাই আমি একজন দোকানদার হিসেবেই লেখাটি লিখছি। দীর্ঘ নয় বছর ঢাকা এবং খুলনা মিলিয়ে বেতন ও কাজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনে বেশ কয়েকটি দোকান আমার পরিবর্তন করতে হয়েছে। সাধারণ ক্রেতা থেকে সর্বোচ্চ অর্থাৎ খুব বেশি দামে যারা কেনাকাটা করে তাদের পর্যায়ের ক্রেতার সঙ্গে আমার কথা হতো। কখনো দামের বিষয়টা বোঝানো আবার কখনো বা কোয়ালিটি সম্পর্কে নানান রকম সত্য– মিথ্যা মিলিয়ে ক্রেতাকে খুশি করানো। কারণ সত্য– মিথ্যা এ জন্য বলতে হয় যে, আমাদের দেশের আবহাওয়া, বিশেষ করে সোনালি ফ্রেমের রঙ থাকে না ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী। কিন্তু যখন আমরা বুঝি যাকে বুঝিয়ে বললে বুঝবে তখন সত্য কথাটাই বলে ফেলি। যখন এর বিপরীত ক্রেতা পাই তখন ঠিক এর উল্টো অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়।

সব ক্রেতাই চায় কম দামে ভালো জিনিস কিনতে। সমস্যাটা হয় এখানেই। কখনো পঞ্চাশ থেকে একশ টাকার মধ্যে আবার কখনো পেয়েছি এক হাজার থেকে ষাট হাজার টাকার ক্রেতাদের। এখানে টাকার ব্যবধান অনেক হলেও দুজনের প্রয়োজনটা সমান। একজনের কোনোমতে কাজ চালানো আবার অন্যজনের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে রুচিবোধ এবং আধুনিক হওয়ার চেষ্টা। একটি ঘটনা বলি।

প্রতিদিনকার মতোই একজন ক্রেতা এসেছেন দোকানে। তিনি তার সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন বোঝাতে এবং তার সঙ্গে কাগজ–কলমে একেও দেখিয়েছেন যে তার বর্ণনা অনুযায়ী একটি ফ্রেম বা সানগ্লাস চাই।

বললাম, ডিজাইনটি কোথাও বা কারো চোখে দেখেছেন কি না। ইতিমধ্যে লেটেস্ট কালেকশন তাকে দেখিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু তিনি তার পছন্দ মেলাতে পারছেন না এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে যা বললেন তা হলো, ডিজাইনটি তার কল্পনার এবং এতোক্ষণ তা–ই আমাকে তিনি একে দেখিয়েছেন।

কথাগুলো শুনে আমি বেশ ক্ষিপ্ত এবং হাসিও পাচ্ছিল। তবে ক্রেতাদের রাগ বুঝতে না দেয়াটাই বিক্রেতার প্রধান দায়িত্বের মধ্যে একটি।

কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম তিনি আর্কিটেকচারের ছাত্র। তাই আমিও একটু মজা করার জন্য বললাম, আপনাকে একটি ব্র্যান্ড কম্পানির ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেবো। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তাতে করে আপনার কল্পনার ডিজাইনটি পেয়ে যেতে পারেন। আমরাও একটি লেটেস্ট ডিজাইন পাবো।

পরক্ষণেই তিনি একটি মলিন হাসি দিয়ে বিদায় নিলেন।

কেউ একটি চশমা কেনার পাচ বছরের মাথায় গিয়ে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হয়তো বা শুধু অর্থের অভাবে বদলাতে পারে না। আবার কেউ আছেন স্রেফ চশমার কাচটা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে এসে নতুন ডিজাইন দেখতে পেয়ে আরেকটি অর্ডার দিয়ে যান। অথচ তার প্রয়োজন ছিল না।

কেউ আসেন, ঠিক কেউ বললে ভুল হবে। আমার ছোট অভিজ্ঞতায় অনেকেই এসেছেন গান্ধীজির ফ্রেমের মতো অর্থাৎ সম্পূর্ণ গোল সোনালি রঙের ফ্রেমটির খোজে যেটি তৈরি ইংল্যান্ডের আলটন বা আলঘা কম্পানির। এ ধরনের ক্রেতারা ছিল আমার বয়সী (আমার বয়স ছাব্বিশ বছর) এবং আমার থেকে বড়। এটা এখন আর কোনো শৌখিন ক্রেতারা চান না। যারা আমার থেকে প্রায় সাত আট বছরের ছোট।

ব্যবসায়ীদের কোনো দল নেই। তাই আমি মনেপ্রাণে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করি। গান্ধীজির ফ্রেমের মতো ফ্রেম অনেকেই চাইতেন বা চান। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কাছে বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত কালো মোটা ফ্রেমটি (যার নাম লর্ড যা বাংলাদেশের তৈরি) সেটি কেউ চাইলো না! নবীনদের কথা বাদ দিলাম। কিন্তু প্রবীণদের বেলায় কেন এমন হলো, কারণ যাই হোক, এটা নিয়ে আমি চিন্তিত নই। তবে তিনি ছিলেন একই ফ্রেমের চশমার অতি চেনা মুখ।

বর্তমান নেতানেত্রীদের অন্তত চশমার ক্ষেত্রে কোনো বৈশিষ্ট থাকছে না। কারণ সহজলভ্যতা এবং আধুনিক ডিজাইনের সমারোহ। একশ থেকে দুইশ টাকার অভাবে যে দেশের মানুষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও একটি চশমা কিনতে পারে না সে দেশের নেত্রীত্ব দানকারীরা (এখানে শুধু রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের কথা বলছি) কিভাবে একটার পর একটা মডেল ডিজাইন বদলাতে থাকেন এটা আমার বোধগম্য নয়। দামের বিষয়টা তো থাকছেই। যদিও এ কথায় নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার শামিল হলো তবুও চমৎকার এই সুযোগটা হাতছাড়া করলাম না। জানি না আমার এ কথাগুলো বিষয়বস্তুর বাইরে চলে গেল কি না।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই চশমার ব্যবহার, একেক সময় একেক ঢঙ–এ। কখনো চোখের সঙ্গে ভ্রুর সাহায্যে সেটে ধরে একটি মাত্র লেন্স। আবার কখনো বা দুইটি রিংয়ে দুটি লেন্সযোগে নাকের ওপর বসিয়ে দেয়া।

এভাবেই চলতে থাকে চশমার আজ পর্যন্ত রিমেক। চশমার সঙ্গে মানুষের আদিম সম্পর্ক। কারণ *চল্লিশ পার হলেই চালশে*। যার দরুন –
চশমা এমনই এক শয়তান
নাকে বসে ধরে কান।

খুলনা থেকে

কিংবদন্তি

– মাহবুব শিকদার

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর সময় আমি ছিলাম গ্রামের এক স্কুলে ক্লাস এইটের ছাত্র। তখন তার সম্পর্কে আমার ধারণা একেবারেই কম। তবে দেশ পরিচালনার সময় টেলিভিশনে জিন্স প্যান্ট, কেডস, গেঞ্জি পরে নানান মডেলের সানগ্লাস চোখে দিয়ে খাল কাটা কর্মসূচিতে তার প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততার দৃশ্য দেখেছি। তার মৃত্যুর পর শান্তিপ্রিয় মানুষের চোখের জল, রাষ্ট্র পরিচালনায় অশেষ গুণাবলীর কথা রোমন্থন করে অনেককে তখন আফসোস করতে শুনেছি। ওই সময় সচিবালয়ে চাকরিরত আমার জনৈক প্রতিবেশী যে ঘটনাটি বলেছিল তা তুলে ধরছি।

প্রেসিডেন্ট একদিন সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গে জরুরি মিটিংয়ে বসেছেন। ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। হঠাৎ লক্ষ্য করেন রুমে কেউ একজন সিগারেট ফুকছে। তিনি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ধূমপায়ীকে পরামর্শ দেন ধূমপান থেকে বিরত থাকতে। জিয়াউর রহমান অধূমপায়ী ছিলেন।

রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে ওই সচিব বলেন, স্যার, ক্ষমা করবেন। অনেক সময় অপ্রত্যাশিত কিছু ব্যাপার হজম করতে হয় বৈকি! এখন এমনি পরিবেশে আপনার চোখে সানগ্লাস আমার অপছন্দের। তবুও হজম করছি।

সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

প্রেসিডেন্ট তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে প্রিয় সানগ্লাসটি নামিয়ে পাশে রাখলে সচিব সিগারেট নিভিয়ে ফেলেন।

খোদ সরকারপ্রধানের সঙ্গে রসিকতা!

সবার ধারণা সচিবের চাকরিচ্যুতি শুধু সময়ের ব্যাপার।

কিন্তু না। তার চাকরি বহাল তবিয়তে থাকে, কোনো হয়রানি কেউ তাকে করেনি।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পরবর্তী অবিস্মরণীয় ঘটনাপ্রবাহ ও গল্পটি শুনে এর প্রতি আমার কৌতূহল, শ্রদ্ধা বেড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে অনেক কিছু জানতে পারি।

তাই সানগ্লাস পরে চিরতারুণ্যের প্রতীক প্রিয় জিয়ার প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি চিরঅম্লান। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেও যিনি আত্মীয়স্বজনকে রাজনীতি এবং দুর্নীতির নিরাপদ দূরত্বে রেখে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা বর্তমান সময়ের রাজনীতিতে যেন কিংবদন্তিতুল্য।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

পথের সন্ধানে

– আরিফা নাজনীন

গত শতকের আশির দশক থেকে যারা ময়মনসিংহ মেডিকাল কলেজে পড়েছেন, সকলেই আওয়ালস্যারের ক্লাস করেছেন বলে আমার বিশ্বাস। তিনি ফিজিওলজি পড়াতেন। আমি যখন পড়তাম, তিনি ক্লাসে আসতেন নয় দশ বছরের একটা ছেলের হাত ধরে। ক্লাসের সময় ছেলেটা বাইরে দাড়িয়ে থাকতো। স্যারের চোখ ঢাকা থাকতো কালো চমশায়। তিনি জন্মান্ধ নন, কোনো এক দুর্ঘটনায় দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। শুনেছি ক্লাস নেয়ার আগে প্রস্তুতি পর্বে তাকে একজন পেইড রিডার সাহায্য করতো।

ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্নদের চশমা দিয়ে দেখার সুবিধা করে দেয়ার চল প্রাচীনকাল থেকে চলছে। আমিও চশমা পরি। ১৮২৯ সালে দৃষ্টিহীনদের পড়ালেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য লুইস ব্রেইলি প্রবর্তন করেন ব্রেইলি ফন্ট। হাতে অনুভব করা যায় এমন ছয়টি বিন্দুর সমন্বয়ে তৈরি বর্ণমালা। সম্প্রতি অডিও ক্যাসেট, টকিং বুক ও ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন ব্যবহার করে শিক্ষা নেয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে। বর্তমান যুগে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ও দৃষ্টিহীনদের কমপিউটার ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সুবিধা আছে। যেমন কমপিউটার স্ক্রন ম্যাগনিফিকেশন ডিভাইস, ব্রেইলি ক্যারেকটার টাচ প্যাড এবং টেক্সট টু পিচ সিনথেসাইজার। এমনকি কমপিউটারে দৃষ্টিহীনদের গেম খেলারও ব্যবস্থা আছে (Biva soft, ESP software)।

প্রাত্যহিক জীবনকে সহজ করার জন্য চালু হয়েছে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্য নেয়া। তাছাড়া জাপান, কোরিয়ার রাস্তায় যাদের হাটার সুযোগ হয়েছে তারা হয়তো খেয়াল করেছেন ওখানকার ফুটপাথ। প্রতিটি ফুটপাথে সযত্নে Beaded block দিয়ে একটি অংশ গাথা থাকে। সামনে এগিয়ে চলার, থামার বিডগুলো অন্য রকম। দৃষ্টিহীনদের জন্য জেব্রা ক্রসিংয়ে আছে বিশেষ বোতাম। সিগনাল পড়লে স্পিকারে নির্দিষ্ট শব্দ হতে থাকে। দৃষ্টিহীন লোকটি নিরাপদে বিডেড ব্লকের ওপর দিয়ে রাস্তা পার হয়ে যায়। দৃষ্টিহীনদের জন্য আছে ইউনিভার্সিটি।

আমাদের দেশে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন ও দৃষ্টিহীনদের জন্য আমরা খুব বড় কিছু একটা করতে পেরেছি কি? ন্যুনতম আধুনিক সুবিধাগুলোও নিশ্চিত করতে পারিনি। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সব মানুষেরই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে থাকে। আমি, আপনি কেউ এর ব্যতিক্রম নই। পর্যাপ্ত জ্ঞান ও পরিচর্যার অভাবে প্রতি বছর অনেক মা ও শিশু অকালে দৃষ্টিশক্তি হারানোর পথে এগিয়ে যাচ্ছে। নৃশংসতা এবং পরিবহন ব্যবস্থার নিরাপত্তাহীনতাও অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অন্ধত্বের কারণ। একটা বিরাট জনশক্তি ক্রমে পরনির্ভরশীল বোঝায় পরিণত হতে যাচ্ছে। সহানুভূতি সহকারে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিহীনদের জন্য আমাদের সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নেয়া উচিত।

আমাদের দেশের একজন কীর্তিমান দৃষ্টিহীন প্রফেশনাল বর্তমানে জাপানে কর্মরত আছেন। কিছু দিন আগে *এনএইচকে* টেলিভিশন থেকে তার একটি চমৎকার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তিনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্যারা অলিম্পিকে ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয়ার স্বপ্ন লালন করেন। আমাদের দেশে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন দৃষ্টিহীনদের জন্য আমরা প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থাকে সহজতর করার জন্য চেষ্টা করতে পারি। তাদের নিরাপদ চলার পথ, শিক্ষা, মেধা বিকাশের সুযোগ, সেরা টেকনলজির সুবিধাদি ভোগ করার নিশ্চয়তা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আমরা দেশের উপকারে তাদের অবদান যোগ করতে চাই।

ছোটবেলায় দেখেছি, একজনের কাধে হাত রেখে আরেকজন, এভাবে তিন চারজন অন্ধের দল গান গেয়ে গেয়ে মানুষের কৃপা ভিক্ষা করছে, আমার আল্লাহ রাসূলের নাম, দিলে ভরসা...।

এই শতাব্দীতে বাংলাদেশে এমনটি আর দেখতে চাই না। চলুন, সকলে মিলে যাই নিরাপদ পথের সন্ধানে।

নাগাসাকি, জাপান থেকে

arifanazneen@yahoo.com

লাল শুক্রবার

– দবির পাহাড়ী

খুব কম বয়সে একদিন রোজার ঈদ হয়েছিল শুক্রবারে। সঠিক সালটা মনে নেই। ফ্যান্সি দোকান থেকে ছোট চাচার দেয়া সেলামি দিয়ে কিনেছিলাম লাল প্লাষ্টিকের চশমা। যখন বাসায় ফিরেছিলাম বড় আপু আমাকে দেখে হাসতে হাসতে বলেছিলেন *আজ তোর লাল শুক্রবার।*

কিছুক্ষণ চুপ করে ভেবেছিলাম আপু কি বললেন? তারপর থেকে অনেক দিন শুক্রবার এলেই তাকে কোনো এক কারণে লাল চশমায় দেখা লাল শুক্রবার মনে হতো।

তার থেকে অনেক দিন পরে চাচার সানগ্লাস পরা ফর্শা চেহারা দেখে তার সানগ্লাসের মোহে পড়ে গিয়েছিলাম। ব্যস, শুরু হলো একটা ভালো সানগ্লাস কেনার জন্য টাকা জমানো। তবে সেটা অনেক পরের কথা।

১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি। ছোট চাচা যখন দেশে এলেন তখন নানান সময়ে তার কাছ থেকে টাকা পেতাম। সবই জমাতাম সানগ্লাসের জন্য। কখনো মায়ের ব্যাগ থেকে, কখনো ছোট আপুর ব্যাগ থেকে টাকা সরিয়ে জমাতাম। যদিও তাদের কথা শোনা বা কানমলা থেকে রেহাই পেতাম না। তবে তা গায়েই লাগতো না। কারণ পেটে খেলে পিঠে সয়। টাকা জমাতাম আর মিরপুর দশ নাম্বার চশমার দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে সানগ্লাস দেখতাম। ভাবতাম, কবে একটা ভালো সানগ্লাস কেনার মতো টাকা জমাতে পারবো! বাড়তি হাত খরচ পেতাম না। তাই টাকা জমানো সব সময়ই কঠিন হয়ে পড়তো।

এরই মাঝে এসএসসি পাস করলাম। কলেজে ভর্তির পর আমার দৈনন্দিন খরচ বেড়ে গেল। ফলে হাত খরচ যা পেতাম তাতে টাকা জমানো আরো কঠিন হয়ে পড়লো। কালেভদ্রে আত্মীয়দের কাছ থেকে সেলামি পেতাম। এভাবেই চলছিল টাকা জমানো।

ইন্টারমিডিয়েট–এ উত্তীর্ণ হবার পরের মাসে অর্থাৎ ২০০১ সালের ৯ আগস্ট আমার সঞ্চয় গুণে দেখলাম চার হাজার নয়শ সতেরো টাকা। আমার দীর্ঘ পচিশ মাসের সঞ্চয়। সম্পূর্ণ গোনা শেষ করে নিজেই অভিভূত হয়ে গেলাম। সেই মূহূর্তের আনন্দটা ছিল বিরাট একটা নিশ্চিত প্রাপ্তির আগে যে আনন্দ তার মতো।

তার পরদিনই মিরপুর দশ নাম্বার একটা নতুন চশমার দোকান থেকে কালো লেন্সের রূপালি রিম, রূপালি ফ্রেমের একটা পুলিশি সানগ্লাস কিনে আনলাম অনেক পছন্দ অপছন্দের পর। দাম রেখেছিল সাড়ে চার হাজার। কালো কাচের ভেতর দিয়েও বিকেলটাকে লাল লাগছিল। এ আনন্দ কোথায় রাখি। রবীন্দ্রনাথের *হৈমন্তী* গল্পের অপুর মতোই নিজের ভেতরে উপলব্ধি করছিলাম–*আমি পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম, কাহাকে পাইলাম?*

এখনো যখন সানগ্লাসটা চোখে দিই, আগে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকি, এই প্রাপ্তির পূর্ণতা পূর্ণভাবে অনুভব করি। কলেজের পুরনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মজা পায় আর ইউনির্ভাসিটির নতুন বন্ধুরা অবাক হয়ে তাকায়। আমি মিষ্টি করে হাসি এবং তাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির কৌতূহল মেটাতে পচিশ মাসের গল্প বলি। এ গল্প বার বার বলাতেও আনন্দ।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

ডাক্তারের চোখে

– ডা. মঈন উদদীন আহমদ

● অনেকে মনে করেন যে, দূরের জন্য মাইনাস আর কাছের জন্য প্লাস। এটা ভুল ধারণা। দূরের জন্য মাইনাস বা প্লাস যে কোনোটি লাগতে পারে। আবার কাছের জন্য মাইনাস বা প্লাস যে কোনোটি লাগতে পারে।

● অনেকে মনে করেন যে, চশমা ব্যবহার করতে করতে চোখ ভালো হয়ে যায়। এটা ভুল ধারণা। চশমার কোনো ক্ষমতা নেই চোখের ত্রুটি সারানোর। যেমন লাঠির কোনো ক্ষমতা নেই ভাংগা পা ভালো করে দেয়ার। অল্প পাওয়ারের সমস্যা থাকলে তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের আকার–আকৃতি বা গঠন পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় চোখ ভালো হয়ে যায়। বেশি পাওয়ারের সমস্যা থাকলে ভালো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

● শিশু–কিশোর, তরুণ ও যুবকদের দূরে এবং কাছে দেখার জন্য একই রকম পাওয়ারযুক্ত চশমা লাগে।

● ৪০ বছরের বেশি অধিকাংশ বয়স্কদের দূরে এবং কাছের জন্য দুই রকম পাওয়ারের চশমা দরকার যা *বাইফোকাল* চশমা হিসেবে পরিচিত।

● ৪০ বছরের বেশি বয়স্কদের যদি দূরের পাওয়ার স্বাভাবিক থাকে তাহলে শুধু কাছের ছোট ছোট জিনিস দেখা যেমন চাল বাছা, সুইয়ে সুতা পরানো, উকুন বাছা বা লেখাপড়ার জন্য চশমা ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে চিকন ফ্রেমে পুরোটাই পাওয়ারসহ চশমা ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের চশমা হাটা–চলার সময় ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই।

● ৪০ বছরের বেশি বয়স্কদের যদি দূরের জন্য জিরো পাওয়ার লাগে তবে কাছের জন্য যে পাওয়ার দরকার সেই পাওয়ারসহ বাইফোকাল চশমাও ব্যবহার করতে পারেন। এ ধরনের চশমা হাটা–চলার সময় ব্যবহার না করলেও চলে। যাদের দূরে এবং কাছে দেখার জন্য উভয় ক্ষেত্রে পাওয়ার লাগে তাদেরকে সব সময় চশমা পরতে হবে।

● অনেক ক্ষেত্রে চোখ ট্যারা হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ চোখের পাওয়ারের ত্রুটি। এক্ষেত্রে চোখ বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অনুযায়ী সার্বক্ষণিক চশমা ব্যবহার করলে চোখ ট্যারা ভালো হয়ে যায়। তবে এ চিকিৎসা পাচ বছর বয়সের আগে করলে ভালো ও দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

● অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তি, বিশেষত ষাটোর্ধ, বিনা চশমায় কাছের ছোট ছোট কাজ করতে যেমন চাল বাছা, উকুন বাছা, সুইয়ে সুতা পরানো বা বই পড়তে পারেন। সকলেই ভাবেন তার চোখের পাওয়ার খুব ভালো। আসলে এ বয়সে সাধারণত চোখে ছানি পড়ে যায়। ফলে দূরে মাইনাস পাওয়ার এবং কাছের জন্য জিরো অথবা খুবই অল্প পাওয়ারের চশমার প্রয়োজন হয়। চোখ চিকিৎসক কর্তৃক দূরের দৃষ্টি পরীক্ষা করা হয়নি বলে তিনি বা তার স্বজনরা জানতে পারেন না যে, তার দূরের দৃষ্টি কতোখানি খারাপ। যেহেতু কাজ চলার মতো অল্প দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয় না সেহেতু দূরের জন্য চশমা ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করেন না।

● কেউ কেউ চশমার বিকল্প কনটাক্ট লেন্স ব্যবহার করেন। এটি চোখের পাতার পেছনে পরতে হয়। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে খুলে রাখতে হয়। আমাদের মতো ধূলোবালির দেশে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি হয় বলে এটি ততো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

● চশমার পরিবর্তে *ল্যাসিক* নামে লেসার পদ্ধতিতে অপারেশন করে বিনা চশমায় স্বাভাবিক দৃষ্টি পেতে পারেন। ঢাকার মিরপুর ২ নাম্বারে অবস্থিত চক্ষু হাসপাতালের দোতলায় ও এসবি লেসার সেন্টারে এ ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

● মাথা ব্যথা হলে গাদা গাদা ওষুধ খেয়েও যারা উপকৃত হননি তাদের অন্তত চোখের পাওয়ার পরীক্ষা করা দরকার। অবশ্য চোখে বাত হলে, চোখের প্রেশার বাড়লে বা চোখের মাংসপেশির মধ্যে ভারসাম্যতার অভাব হলেও মাথা ব্যথা হতে পারে।

● জীবনের প্রথম চশমা দামি না নেয়াই উচিত। কারণ চশমা ব্যবহারে অভ্যস্ত না হওয়ায় কেনার অল্প দিনের মধ্যে তা হারিয়ে যায়।

● যে সকল শিশু-কিশোরের চশমার প্রয়োজন তাদের যদি দুই চোখে দুই রকম পাওয়ার থাকে অথবা দুই চোখের পাওয়ার বেশি লাগে এবং যদি তারা নিয়মিত চশমা ব্যবহার না করে তাহলে তাদের দৃষ্টি শক্তি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতে সঠিক পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করেও স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পাবে না। চিকিৎসা শাস্ত্রে একে *অ্যামব্লায়োপিয়া* বলে।

● ৪০উর্ধ যে সকল ব্যক্তি কমপিউটার চালনার সময় বাইফোকাল চশমা ব্যবহার করেন তাদেরকে কমপিউটারের মনিটরের দিকে তাকানোর সময় মাথা পেছনের দিকে সরিয়ে থুতনিটা উপরের দিকে তুলে চশমার কাছের নিচের অংশ দিয়ে দেখতে হয় বলে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। সে কারণে কমপিউটার চালনার সময় ফ্রেমের পুরোটাতেই শুধু কাছের পাওয়ারযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা উচিত।

● চশমার লেন্স কাচ বা প্লাস্টিক দুই রকমের হতে পারে। প্লাস্টিকের লেন্স হালকা, পড়ে গেলে ভাঙে না। তবে দাম বেশি।

বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ঢাকা থেকে

আদর্শ

– নাহার

হলের সামনে বাবা তার মেয়ের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন। কেউবা পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কেউ বা বাবার পাঠানো চিঠি নিয়ে আনন্দে – দে ছুট।... কখনো বাবা তার মেয়েকে না পেয়ে ব্যাগ হাতে শূন্য দৃষ্টিতে আকাশকে ভালো করে চেয়ে দেখেন। আর আমি তো সেই চার বছর বয়সেই এ সকল অধিকার উদাত্ত হাতে মাকে দিয়েছি। ১৯৮৫ সালে বাবা মারা যান।

সেই ক্লাস ওয়ান থেকে মাকে কখনো শান্তিতে থাকতে কিংবা বিশ্রাম নিতে দেখিনি। দেখেছি যুদ্ধ করতে। এতো সব প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি তার দায়িত্বগুলো পালন করেছেন নিখুতভাবে, যত্ন সহকারে। কতো রকমের ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন যে তার ওপর বয়েছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। তবুও তার নীতি, আদর্শ, বিবেক, মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেনি বিন্দুমাত্র। শত বাধা-বিপত্তির মাঝেও তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিবর্তন হয়নি। তার দূরদর্শিতা আমাদেরকে চারদিক সম্পর্কে জানতে শেখায়।

হাড় কাপানো শীতে বাশের ফাক দিয়ে কতো যে হিমেল বাতাস ঢুকেছে বৃষ্টির পানিতে কতোবার যে খাট ভিজেছে, চারপাশে বিদ্যুতের ঝলমলানির মাঝেও বাসায় নীরবে কেরোসিনের কুপি জ্বলেছে, কতো উৎসবের দিন যে আলু ভর্তা ভাত খেয়েছি সে কথা বলে শেষ করা যাবে না। এতোসব বিপত্তিকে উপেক্ষা করে বলতেন, পড়াশোনা করো, মানুষ এবং স্বশিক্ষিত হও, মেয়ে বলে পিছিয়ে থাকবে না।

ছয়জন ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার উপকরণ জুগিয়ে মা আজ ক্লান্ত। নানান জটিল কাজের আবর্তে তিনি তার চশমার কথা ভুলে যান। সেই পুরনো মান্ধাতা আমলের ফ্রেমকে বড়ই আপন মনে হয়। বাহ্যিক চাকচিক্য আমাদেরকে আকর্ষণ করে না। বেচে আছি আদর্শ নিয়ে। আমার অন্তর নিংড়ানো শ্রদ্ধা, ভালোবাসা চশমা পরা এই বৃদ্ধার প্রতি যিনি সাধারণ মানুষের মাঝে অসাধারণ বৈশিষ্ট খুজে পান।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি থেকে

ঘটক

– জিদনী

মায়ের যদি কোনো ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি এই মুহূর্তে ভস্ম হয়ে যেতাম। যেভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তাতে মনে হচ্ছে আমি যেন তিন দিনের বাসি তরকারি কিংবা কোনো পচা–গলা অখাদ্য। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম এক্ষুণি শুরু হবে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়।

আমার এক বন্ধু একবার বলেছিল, শোন যখন কোনো দোষ করবি, দেখবি বকা খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা, তখন উল্টো সবাইকে ধমকাবি। সবাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবে, ধমক দেয়ার চান্সই পাবে না।

সেই পথে বাচার চেষ্টা করলাম। লাভ হলো না। মা ততোক্ষণে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করেছেন। এখন কিছু বলতে গেলে হয়তো আর বকবেন না, ধরে মার–ই লাগাবেন। কলেজে উঠেছি, এখন মায়ের হাতে পিটুনি খাওয়াটা কোনো কাজের কথা হতে পারে না। কাজেই চুপ হয়ে গেলাম। নীরবে হজম করলাম মায়ের মধুর সব সম্ভাষণ।

কিছুক্ষণ পর অবশ্য মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এবারেরটা কোথায় খোয়ালি?

এখন আমার পার্ট নেয়ার পালা। গলায় রাগ অভিমান ঢেলে বললাম, জেনে আর কি করবে? বকা যা দেয়ার তা তো দিয়েই ফেলেছো।

খাপসহ হারিয়েছিস, নাকি খাপ ছাড়া?

খাপসহ।

মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে হয়তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

আমি তো অবাক। পাওয়া যেতে পারে? কি করে?

এবারেরটার খাপের ভেতরের দিকে আমি নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার কাগজে লিখে রেখে দিয়েছিলাম। চোর চামারের হাতে না পড়লে হয়তো ফেরত পাওয়া যাবে।

বাবা বাড়ি ফিরে সব শুনে আরো এক দফা বকতে এলেন।

কিন্তু মা বাধা দিলেন। বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থামো তো! মেয়েটা বাড়িতে ঢুকেই বকা খেয়েছে, তুমি আর বকো না।

তুমি তো বলবেই! তুমি বুঝবে কি? রোজগার করতে হয় না তো! এই নিয়ে পাচ নাম্বার। ওহ! এই মেয়ে আমাকে ডোবাবে। এতো বড় হয়েছে, তবু কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই।

আমারও মন খারাপ। এবারেরটা বেশ দামি ছিল। পাচ আমার লাকি নাম্বার। তাই ভেবেছিলাম এটা হয়তো হারাবে না। বাবার দেয়া টাকার সঙ্গে নিজের টাকা যোগ করে কিনেছিলাম। গেল, এটাও গেল। কেন যে এতো ভুলোমনা হলাম!

এতো বকাঝকা, রাগারাগি আর মন খারাপের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে *সেই শয়তান যে নাকে বসে ধরে কান।* হ্যা, একটি চশমা। চশমা নিয়েছি এক বছরও হয়নি। এরই মধ্যে এ নিয়ে পাচটা চশমা হারালাম। বাবা মায়ের রাগ করাটা স্বাভাবিক। আমারও কি কম রাগ লাগছে?

রাতে বারান্দায় একা একা পায়চারী করছি। মনে করার চেষ্টা করছি কোথায় হারালাম চশমাটা। এমন সময় ফোনের শব্দে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। এতো রাতে আবার কে?

হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। সুপ্তি আছেন?

বলছি। আপনি কে বলছেন?

আমি একটা চশমা পেয়েছি। ভেতরে আপনার নাম, ঠিকানা আর ফোন নাম্বার।

চশমাটা পেয়েছেন? কোথায়?

ওটা এখন আমার কাছে। আপনি ফেরত চান নিশ্চয়ই?

হ্যা, অবশ্যই!

তাহলে এক কাজ করুন। কাল সকাল নয়টায় উত্তরায় আর্চিস–এর যে গিফট শপটা আছে ওটার সামনে চলে আসুন। আপনার বাসা থেকে তো কাছেই, তাই না?

হ্যা, কাছেই। কিন্তু আপনাকে চিনবো কি করে?

আমার হাতে খাপসহ আপনার চশমাটা থাকবে।

ও তাই তো! ঠিক আছে, আমি অবশ্যই আসবো। নয়টায় তো?

হ্যা, নয়টা।

ওকে, থ্যাংকস!

মাই প্লেজার!

সকালে মাকে সব বললাম।

সব শুনে মা বললেন, একলা যাবি?

আরে না! দোতলার তানিয়াকে নিয়ে যাবো।

বেশ, তাহলে যা।

নয়টা পাচ বাজে। আর্চিসের সামনে দাড়িয়ে আছি দশ মিনিটও হয়নি। কিন্তু মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছি। তানিয়াও উসখুশ করছে।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বললো, এক্সকিউজ মি!

পেছন ফিরে আমার চোখ চকড় গাছ। আরে, এই ছেলে এখানে? গতকাল বাসে আমার পেছনের সিটে বসেছিল। জানালা খোলা নিয়ে এর সঙ্গে কথা কাটাকাটিও করেছি। চশমাটা কি তাহলে এর কাছে...।

আপনি কি সুপ্তি?

জি।

আমি রকিব। আপনার চশমাটা আমিই পেয়েছিলাম। এই যে নিন।

চশমাটা নিতে নিতে বললাম, সরি, গতকাল আপনার সঙ্গে মিসবিহেভ করে ফেলেছি।

না, না ঠিক আছে। দোষ তো আমারও ছিল।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

উহু, শুধু ধন্যবাদে তো চিড়া ভিজবে না!

তাহলে? কি করতে পারি আপনার জন্য?

ছেলেটি রহস্যময় হাসি হেসে বললো, আপনার চশমাকে প্রশ্ন করুন।

বলে আর দাড়ালো না। চট করে একটা রিকশায় উঠে পড়লো। চশমার খাপ খুলে দেখি ভেতরে চশমা ছাড়াও একটা চিরকুট। না, মায়ের লেখা সেই চিরকুটটা নয়, এটাতে ছেলেটির নাম, ঠিকানা আর ফোন নাম্বার লেখা। নিচে লেখা, *ফোনের অপেক্ষায় রইলাম।...*

এই পর্যন্ত লেখার পর রকিব এসে দাড়ালো সুপ্তির পাশে। তারপর রকিব লেখাটি দেখিয়ে সুপ্তিকে বললো, বেশ হচ্ছিল। শেষ করোনি কেন?

কি লিখবো বুঝতে পারছিলাম না।

কি লিখবে মানে? এরপর আমাদের টেলিফোনিক গল্প, কথা, সময়ের প্রবাহ, বাবা মায়ের সিদ্ধান্ত, ফলাফল শুভ বিয়ে এবং বর্তমান। হাত ধরে পথ চলা, চোখের ভাষায় কথা বলা, এই তো? না, হলো না। তোমার নাক কানে এটে বসা ওই হোদল কুতকুত কাচ দুটোর ভেতর দিয়ে কথা বলা যায়?

এই খবরদার! আমার চশমাকে গাল দেবে না। ভুলে গেলে। এটাই তো আমাদের ঘটক *পাখিভাই*।

ওরা এখন অব্যক্ত কথাগুলো পড়ে নেয় চোখের ভাষায়। না, পুরু লেন্সের চশমাটা বাধা হয়ে দাড়ায় না, এটা যে তাদের ভালোবাসার সেতুবন্ধন!

আশকোনা, ঢাকা থেকে

কানার গোষ্ঠি

– রফিকুল ইসলাম বুলবুল

গ্রামের সবাই আমাদের পরিবারের লোকদেরকে বলে, কানার গোষ্ঠির লোক। তার অবশ্য যথাযথ কারণও আছে। আমাদের পরিবারের সবাই চশমা ব্যবহার করেন। কোনো ফ্যাশনের জন্য নয়, নিতান্ত দায়ে পরেই সবাই চশমা ব্যবহার করেন। আব্বা, মা, চাচা-চাচি, বড় দুই ভাই, দুই আপা, চাচাতো ভাইবোনেরা সবাই এ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

তখনো আমি এই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হইনি। সবার চশমা পরা দেখে আমার ভালোই লাগে। আমারও ইচ্ছা জাগে চশমা পরার। কিন্তু ইচ্ছাই সব কিছুর শেষ নয়, তার জন্য চাই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। তাই একদিন মাকে বললাম চশমা পরার কথা। তিনি রাজি হলেন না। কারণ আমার চোখে তখনো কোনো সমস্যা দেখা যায়নি। মনে মনে চিন্তা করতে থাকি কিভাবে চশমা নেয়া যায়। কিন্তু তেমন কোনো উপায় খুজে পাই না। আমার বড় ভাই একজন ডাক্তার। তিনি বিদেশে থাকেন এবং প্রতি বছর দেড় মাসের ছুটিতে বাড়িতে আসেন। এই সময় আমাদের আশপাশের প্রচুর রোগী তার কাছে আসে চিকিৎসার জন্য। তিনি তার সাধ্যমতো চিকিৎসা করে থাকেন।

এভাবেই একদিন একটি ছেলে এলো তার বাবার সঙ্গে। সে ভাইকে জানালো তার চোখ দিয়ে পানি পড়ে এবং পড়ার সময় প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করে। ভাই তাকে পরামর্শ দিলেন একজন চোখের ডাক্তার দেখানোর জন্য।

ছেলেটির বাবা তাকে চোখের ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তার তার চোখের সমস্যার কথা বলেছেন এবং চশমা ব্যবহার করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। দুদিন পরে আমিও ছেলেটির মতো একই কথা বললাম বড় ভাইকে। তিনি আমাকে আমাদের জেলা শহরের একজন চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠালেন মেজ ভাইয়ের সঙ্গে।

ডাক্তার আমাকে বললেন, কি সমস্যা?

আমার বানানো সমস্যাগুলো তাকে বললাম।

তিনি তখন আমাকে আয়নার মধ্যে দিয়ে কিছু অক্ষর দেখালেন এবং লাঠি দিয়ে নির্দেশ করে প্রশ্ন করেন এটা কি, ওটা কি?

আমি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরগুলোকে ঠিক ঠিক উত্তর দিলাম। কিন্তু ছোট অক্ষরগুলো ইচ্ছা করেই ভুল করলাম।

তিনি আমাকে -25 লেন্সের চশমা ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন।

মহা আনন্দে সেদিনই ভাইয়ের সঙ্গে গেলাম চশমার অর্ডার দিতে। কিন্তু আনন্দের অনেকটাই ভাটা পরলো। কারণ আমার পছন্দ মেজ ভাইয়ের মতো সোনালি কালার ফ্রেমের। তিনি অর্ডার দিলেন কফি কালার-এর প্লাস্টিকের ফ্রেমের চশমা।

দুদিন পরে চশমা হাতে পেলাম এবং চোখে দিলাম। কিন্তু একি? চশমা পরে মনে হচ্ছে মাটি অনেক দূরে চলে গেছে এবং খালি চোখেই চশমার চেয়ে অনেক ভালো দেখি। তাই চশমার প্রতি প্রথম দিনই আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। ফলে বড় ভাইয়ের সামনে গেলে চশমা পরি, অন্য সময় পরি না। কিছু দিন পরে একদম চশমা ব্যবহার করা বন্ধ করে দিলাম।

তারপর অনেক সময়। এসএসসি, এইচএসসি পাস করলাম। ভর্তি হলাম ঢাকার একটি বেসরকারি ইউনিভার্সিটি বি.এস.সি ফিজিওথেরাপিতে। বড় ভাই ততোদিনে দেশে চলে এসেছেন এবং ঢাকায় থাকেন। আমিও তার সঙ্গেই থাকি।

ফিজিওথেরাপিতে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পরই বুঝতে পারলাম এখন প্রকৃত সময় হয়েছে চশমা পরার। কারণ পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ। তাই পড়তে হয় বেশি সময়। বেশি সময় পড়লে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয়। ভাইয়ের পরামর্শে আবার চোখ দেখালাম। আগের তুলনায় চোখের পাওয়ার এখন অনেক বেশি (-50 এবং -75)।

এবার কোনো সমস্যা নয়। কেননা নিজের পছন্দ মতো চশমার দিয়ে সেদিন বিকেলেই চশমা নিয়েছি। কিন্তু চোখে দেয়ার পরে সেই আগের অবস্থা। মনে হয় পায়ের নিচের মাটি অনেক দূরে সরে গেছে। এবার কোনো ফাকিবাজির সুযোগ নেই। চশমা ব্যবহার করলে মাথা ব্যথা থাকে না। এখন আমি বাধ্য হয়েই নিয়মিত চশমা ব্যবহার করি।

দেখতে দেখতে চারটা বছর শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে শেষ হলো আমার শিক্ষা জীবন। এখনো নিয়মিত চোখ দেখাই চোখের ডাক্তারকে। প্রতিবারই বাড়ছে চোখের পাওয়ার, সেই সঙ্গে পুরু হচ্ছে চশমার গ্লাস। এখন ইচ্ছা করেও চশমা না ব্যবহার করে থাকতে পারি না।

ভাবলে অবাক লাগে, আমিও এখন কানার গোষ্ঠির একজন নবাগত সদস্য।

তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ থেকে

ঝাপসা

– জিএস দ্বীন

ইটালি প্রবাসী এক লেখক প্রবাসীদের বিভিন্ন দুঃখ–কষ্টের বর্ণনা দিয়ে বাংলাদেশের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লেখেন, প্রবাসীদের যারা বৌ নিয়ে আছে তাদের কেউ কেউ আতংকে আছে যে, কখন কার বৌ কার সঙ্গে চলে যায়! লেখক যেখানে বসবাস করেন সেখানে বসবাসরত বাংলাদেশি কয়েকজন মুখোশধারী ভদ্রলোক লেখকের প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে ইন্ধন দিয়ে প্রবাসীদের একটা অংশকে এই বলে খেপিয়ে তোলেন যে, এই লেখার মাধ্যমে প্রবাসীদের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা হয়েছে।

ইটালির আইনকে উপেক্ষা করে লেখককে বাংলাদেশি কায়দায় বিভিন্ন হুমকি–ধামকি দেয়া হয়। পরিস্থিতি খুব বেগতিক দেখে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। যদিও ইটালির আইন অনুযায়ী লেখকের যে কোনো বিষয়ে লেখার যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে এবং কোনো লেখার জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।

যাক, নির্দিষ্ট দিনে সবাই একত্রিত হলে বৈঠক হওয়ার আগে এক ভদ্রলোক উল্লিখিত লেখার পক্ষে কয়েকটি সত্য ঘটনা এবং যুক্তি প্রকাশ করলে জনতার ওই অংশটি তার ওপর খেপে যায়। পরক্ষণে বৈঠকে লেখকের দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে প্রাথমিক সমস্যার সমাধান হলেও বৈঠক শেষ হতে না হতেই কয়েকজন লেখার

পক্ষাবলম্বনকারী ব্যক্তির ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাচানোর জন্য কয়েকজন সামনে পড়ে আক্রমণকারীদের থামানোর চেষ্টা করে।

এদের একজনের চোখে ছিল চশমা। আকস্মিকভাবে একটি আঘাত তার চোখে লাগে। চশমা ভেঙে কাচ লেগে তার চোখের নিচে অনেকখানি কেটে যায়। আরেকটু উপরে লাগলেই তার একটা চোখ চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতো হয়তো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে ফিল্মি কায়দায় সবাই কেটে পড়লো। মুখোশধারী ভদ্রলোকরাও মুচকি হেসে বিদায় নিল।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই একজনের বৌ দ্বিতীয়বার স্বামী পরিবর্তন করে তৃতীয় জনের হাত ধরে চলে গেল। আবার নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি গুঞ্জন বাতাসে ভেসে উঠলো যে, আরো কয়েকটি বৌ নাকি উড়ু উড়ু ভাব ধরেছে। যে কোনো মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে।

এবার অনেকেই বৌদের ব্যাপারে সত্যি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ওই লেখাটি আবার আলোচনার টেবিলে এলো। এ রকম এক আলোচনায় চশমার কাচ মুছতে মুছতে একজন বললেন, তিনি তো ঠিকই লিখেছেন। যা শোনা যাচ্ছে, কখন কার বৌ কার সঙ্গে চলে যায় সত্যিই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। আতংকিত হওয়ারই কথা।

পাশ থেকে আরেকজন বললেন, আপনার মতো অনেকেরই চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে পড়েছে যার কারণে তারা বৌদের প্রতি সঠিকভাবে নজর রাখতে পারছে না। তাদের উচিত এখনই ঝাপসা হয়ে যাওয়া চশমার কাচ ভালোভাবে পরিষ্কার করে বৌদের প্রতি ভালোভাবে দৃষ্টি দেয়া যাতে কালো চশমার ফাক দিয়ে বন্ধু-বান্ধবের কুদৃষ্টি নিজের বৌয়ের ওপর না পড়ে।

ইটালি থেকে

জন্মদিনের গিফট

– মোহাম্মদ সোহেল

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তাই ইচ্ছে থাকার পরও অর্থের অভাবে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারিনি। আমার বাবা, মা, পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাবা, মা। তাদের মুখের পানে তাকিয়ে পাড়ি জমাই ১৯৯৭ সালে সুদূর প্রবাস সিংগাপুরে। বাবা অনেক কষ্ট করে চাকরি থেকে ও সহায়-সম্বল সব কিছু বিক্রি করে আমাকে পাঠান এই সিংগাপুরে। আমারও বুকের ভেতর অনেক আশা ভর করে আছে ছোট বড় ভাইবোনদের জন্য। অনেক স্বপ্ন দেখি, একদিন কোটিপতি হবো। কিন্তু হায় আশার গুড়ে বালি।

সিংগাপুরে এসে দেখি কাজ নেই কাজ করলে বেতন বেতন নেই। কিছু দিন পর শুরু হলো কম্পানির অত্যাচার। এরপর আমার স্বপ্নকে ভেঙে পাঠিয়ে দিল আমাকেসহ সব লোককে দেশে। দেশে এসে কারো সঙ্গে মুখ দেখাতে পারি না, বিশেষ করে আমাদের প্রতিপক্ষ আমার চাচারা ও ফুপুরা যারা আমাদের ভালো চায় না তারা তো মহা খুশি।

যাই হোক। আবার চেষ্টা। এবার অনেক ঘোরাফেরার পর ভাগ্য আমাকে টেনে নিয়ে আসে এ সেই সিংগাপুরে তবে বৈধভাবে নয়, অবৈধভাবে। শুরু হলো জীবন যুদ্ধ। জীবন যুদ্ধে আমাকে জয়ী হতেই হবে। অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে পার করলাম এক বছর।

এর মধ্যে কিছুটা হালকা করে ফেলেছি নিজেকে ও সংসারটাকে। মোটামুটি ইনকাম। মানিব্যাগ ভরা ডলার। ভাবতে ভালোই লাগে। মাঝে মধ্যে মনে ইচ্ছে হয়, আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে উঠি। আমি কাজ করি থমসন রোডে এক গার্ডেনে সিংগাপুরে টিভি স্টেশনের খুব কাছে। তো আমার প্রথম কোনো বিদেশিনীর মেয়ের প্রেমে পড়া।

সে আমার খুব পাশে থাকে। আজ খুব কাছাকাছি কাজ করছি। ভালোই লাগছে কাজ। হচ্ছে না কিছুই। তার দিকে তাকিয়ে আছি। সেও তাই।

এক সময় মেয়েটাকে বললাম, তোমাকে ভালো লাগে।

মেয়েটিও সায় দিল।

শুরু হলো ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা। মেয়েটি আমাকে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু এখন আমার ব্যাপারে বলে নেই আমি আবার স্বার্থপর ছেলে ভালোবাসা কি জানি না। তবে দৈহিকভাবে মেলামেশাই আমি মনে করি ভালোবাসা। প্রতিদিন আমার কাজ সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।

কাজ শেষে রাত নয়টার দিকে তার জন্য অপেক্ষা করি। ছোট একটা পার্ক গাছপালা ঘেরা। কেউ দেখে মনে করবে না এর ভেতর চলছে নিষিদ্ধ মেলামেশা।

মেয়েটির নাম ফারিডা। শরীরের গঠন মোটামুটি ভালো। স্তন দুটি বেশ সুন্দর। তার কাছে যখন যেতাম তখন আর নিজেকে সামলাতে পারতাম না। তার শরীরের ভেতর প্রবেশ করে আমার সব কিছু নিস্তেজ ও শান্ত হয়ে যেতো।

ফারিডা আমাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে আমার বৌ হবে। আমার দেশে যাবে।

আমিও তাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আগলে রাখি।

হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার জন্মদিনের তারিখ।

সেদিন নিজের অজান্তেই বলেছিলাম ২৬ মার্চ। দিনটি ছিল রবিবার। হলিডে।

সেদিন মেয়েটি আমার জন্য অপেক্ষা করছে একটি প্যাকেট হাতে নিয়ে।

আমি হঠাৎ চমকে উঠি এবং বলি, চলে যাচ্ছো নাকি। সে হেসে বলে, তোমার জন্য।

আরো একটি কথা। মেয়েটি প্রতিদিন বাইরে আসতো একটি কুকুর সঙ্গে নিয়ে। কারণ তার মালিক কুকুরটিকে ঘোরানোর জন্যই তার বাইরে আসা।

তারপর প্যাকেটটি আমি নিতে অস্বীকার করায় মেয়েটি খুব অনুরোধ করলো।

এরপর যখন প্যাকেটটি খুলে বের করলাম, দেখতে পেলাম, একটি সেন্ট ও একটি সানগ্লাস। আমি তখন হাসতে হাসতে তাকে বললাম, সানগ্লাসটি আমি তোমার সঙ্গের এক সঙ্গীকে গিফট করবো।

তখন তার উজ্জ্বল মুখখানি কালো করে বললো, কে সে? হাসতে হাসতে পড়ে গেল আমার বুকের মাঝে।

মনে পড়ে সেদিনের কুকুরের চোখে চশমা পরা দেখে লুটিয়ে পড়া হাসির সেই মেয়েটির কথা! কিছু স্মৃতি আছে যা মনের গভীরে আজো হাসায়।

সিংগাপুর থেকে

সুখের পরশ

– রুনা ইয়াছমিন

আজ পুরো ঘর জুড়ে হই চই। বাবার চশমাটা কেথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা এমনিতেই খুব মেজাজি। তার ওপর আবার বাবার চশমাই খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। চশমা খুজে না পাওয়ায় বাবার মেজাজে ঘরের সবাই মাথা নিচু করে আছে।

শুধু খুশি বাবার আদরের দুই বছরের নাতি পিয়াল।

বাবা চশমা হারানোর কষ্টে বলা শুরু করলেন চশমা কেনার ইতিহাস। বাবা বলছিলেন, তোমরা ছিলে তখন ছোট। তোমাদের পড়াশোনার খরচ যোগাতে ও সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলাম। এই টানাটানির মধ্যে

তোমাদের বড় বোন রুমাকে বিয়ে দিলাম। হাত একেবারে শূন্য। এর মধ্যেই হঠাৎ করে চোখে সমস্যা দেখা দিল। চোখের ভেতর কাটা কাটা লাগে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে। সবাই বললো, বরিশাল থেকে ভালো ডাক্তার আসেন, তাকে দেখান। ডাক্তারের ফি পাচশ টাকা। ওষুধপত্র ও চশমাসহ হাজার দুই টাকা লাগবে। তখন টাকার চিন্তায় মনে হয়েছিল অন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।

হঠাৎ করে আমাকে আশার আলো দেখালেন আমাদের অফিসের আনিস সাহেব। তিনি ডাক্তার ও ওষুধপত্রের টাকা দিলেন। ডাক্তারের দেয়া চশমা আনিস আমাকে পরিয়ে দিলেন। তার দেয়া চশমা দীর্ঘ বিশ বছর আমার চোখে। এই চশমা দিয়ে দেখেছি তোমাদের বড় হওয়া, তোমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই চশমায় দেখি আনিসকে। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত চশমাটাই এখন পাচ্ছি না। আমার কষ্টটা তোমরা কেউ উপলব্ধি করতে পারছো না।

চশমার ইতিহাস শুনতে সবাই যখন ব্যস্ত তখন বাবাকে মা বলে উঠলেন, ওগো, তোমার আদরের নাতি পিয়ালকে কোথাও খুজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবাসহ আমরা সবাই চতুর্দিক খুজতে শুরু করলাম। পাশের পুকুরে জাল মারলাম। বড় মাছ ওঠে কিন্তু পিয়াল নেই। অবশেষে থানা পুলিশ শেষ করে ঘরে যখন সবাই একত্রিত হয়েছি তখন পিয়াল বের হলো বাবার খাটের নিচ থেকে। হাতে বাবার বিশ বছরের পুরনো চশমা।

সবাই অবাক! এতোক্ষণ কি তুলকালাম ঘটনাই না ঘটলো।

বাবার মলিন মুখ হাসিতে ভরে উঠলো। সব জেদ আদরে পরিণত হলো। বাবা তার আদরের নাতি পিয়ালকে কোলে নিয়ে চুমু খেলেন। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

আজ বাবা নেই, আছে বিশ বছরের পুরনো চশমা। বাবার আদরের নাতি প্রতিদিন চশমা মুছে মুছে রাখে কাঠের আলমারিতে। চশমাটার দিকে তাকালে মনে হয়, বাবা জেদ ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। আবার মনে হয়, আমাদের সবাইকে আদর করছেন। বাবার চশমাটা যেন পুরো ঘর জুড়ে আছে সুখের পরশ হয়ে।

হাজিপাড়া, গৌরনদী থেকে

নদীর নাম গোদাবরি

– এম.এ বারী ময়না

চশমা নিয়ে অনেক কিছুই লেখা যায়। সানগ্লাস পরে ফিল্ডিং দেয়া, সানগ্লাস পরে অফিসে যাওয়া বা গাড়িতে ভ্রমণ করা নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে যায়। আমি এসব কিছুর ধারে কাছে যাচ্ছি না। কেননা চশমা হারিয়ে আমি কয়েকদিন আগে যে সুখের সাগরে অবগাহন করেছি তা আমার স্মৃতিতে বহুদিন অম্লান থাকবে। ঘটনাটা একটু পরে বলছি। তার আগে বলা দরকার যে জীবনে আমার উল্লেখযোগ্য কোনো রেকর্ড নেই। শুধু চশমা হারানোর রেকর্ডটি দারুণ উজ্জ্বল। পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করলে জাতীয় পর্যায়ে না হোক নেহায়েত জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় নামটি গোড়ার দিকেই থাকবে বলে আমার স্ত্রীর বিশ্বাস।

আমার চশমা হারানোর এমন পরিস্থিতি দেখে আমার এক বন্ধু কম দামের চায়নিজ চশমা কেনার পরামর্শ দেয়। কম দামে কেনা সেই রিডিং চশমা ব্যবহারে খুবই আরাম এবং খুবই হালকা-পাতলা। তাই এগুলো আরো বেশি হারাতে লাগলো এবং আজ পর্যন্ত হারিয়ে চলেছি। মনে হয় এ হারানোর কোনো ইতি হবে না। থাক, আসল ঘটনায় আসা যাক। চশমা হারানোর ভেতর সুখ বা আনন্দ থাকে কেমন করে! একটু অপেক্ষা করুন বলছি। তবে তার আগে একটু আগের কথা না বললে ঘটনার গুরুত্ব থাকবে না।

আমার সবচেয়ে ছোট শ্যালক ইকবাল তার স্ত্রী ঝিনুক এবং তার ভ্রাতা শিফনের সত্ত্বর ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু সঙ্গে যাবে কে? একজন জানাশোনা, বিচক্ষণ লোকের তো দরকার। পরিবারের সবাই মিলে আমাকে নির্বাচিত করলো। কেননা আমি নাকি একটু হিন্দি, উর্দু বলতে পারি। এছাড়া আরো যুক্তি দেখালো আমি সদ্য অবসরপ্রাপ্ত। ঘুমানো এবং বাজার করা ছাড়া নাকি আমার কোনো কাজ নেই। অথচ সারা দিন মোটা মোটা বই পড়ি, তিন চারটা খবরের কাগজ পড়ি যেগুলো নাকি কোনো কাজই না।

আমার আপত্তি গ্রাহ্য হলো না। অবশেষে শ্যালকদের সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরের পথে রওনা হলাম। রওনার হওয়ার আগে ওদের বড় বোন অর্থাৎ আমার স্ত্রী সব গোছগাছ করে দিল। দুটি অতিরিক্ত চশমা ব্যাগে ভরে দিল। এবং এ চশমাগুলো রক্ষার জন্য শ্যালকদের সবাইকে চশমা রক্ষা কমিটির সদস্য করে দিল। তারা সবাই এক বাক্যে এ গুরুদায়িত্ব পালন করার অঙ্গীকার করলো।

মাস খানেক আগে কলকাতায় এসে একমাত্র চশমা হারিয়ে খুব বিপাকে পড়েছিলাম। অর্থাৎ দশ টাকার নোটের জায়গায় পঞ্চাশ টাকার নোট দোকানে দিয়েছিলাম। আর কয়েন তো দেখতেই পেতাম না। এর জন্য এবার এই সতর্ক অবস্থা।

কলকাতার *গৃন ইন হোটেল*-এ বসে আমার সঙ্গে নেয়া ইনডিয়ার কয়েকটি প্রদেশের মানচিত্র, টুরিজম ম্যাপ এবং কলকাতা-চেন্নাই-ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন রুট ইত্যাদি ভালোভাবে পড়তে লাগলাম। দূরে কোথাও গেলে সেই স্থানের অবস্থান, এর যাতায়াত পথ এবং পথে কোন জায়গা, কোনো পাহাড় বা উল্লেখযোগ্য নদী পড়বে তা তন্ন তন্ন করে খুজে দেখা আমার স্বভাব।

আমার ম্যাপ দেখা নিয়ে দলের সদস্যরা হাসাহাসি করলো।

তাদেরকে বললাম, ট্রেনটি কোনদিক দিয়ে যাবে, কোথায় কোথায় থামবে বা কোন সময়ে পৌছাবে মোটামুটি বলে দিতে পারবো।

তারা একথায় কোনো কর্ণপাত না করে আমার চশমা রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলো। এবং হাওড়া থেকে ট্রেন ছাড়ার পর দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য শিফন জিজ্ঞাসা করলো, দুলাভাই, এরপর কোন স্টপেজ?

বললাম, খড়গপুর।

এভাবে দুই চারটি স্টপেজ মিলে যাওয়ায় ম্যাপ দেখার প্রতি আগ্রহ জন্মালো। যে কোনো স্টেশন পেরিয়ে গেলেই সে জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলো, এ স্টেশন ম্যাপে আছে কি না বা এরপরের স্টপেজ কোনটি, আমরা এখন ম্যাপের কোন স্থানে অবস্থান করছি ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম, শিফনকে ম্যাপ বিষয়ে আইডিয়া দিয়ে মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। কেননা আমার ঘুমের বারোটা বাজলো। বার বার উত্যক্ত করতে লাগলো ভুবনেশ্বর কখন আসবে, অমুকটা রাত কয়টা বাজলে দেখা যাবে।

উপায়ান্তর না পেয়ে বললাম, আজ রাতে ট্রেন কোথাও থামবে না বা দেখার কিছুই নেই। সবাই ঘুমাও। কেননা সকালের দিকে আমরা একটি ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন নদী পার হবো। নদীর নাম গোদাবরি। নদীটি দেখার আমারও অদম্য আগ্রহ। ইনডিয়ার বেশ কয়েকটি নদী যেমন গোদাবরি, কৃষ্ণা, বারেবি, নর্মদা, চম্বল বিভিন্ন বইপুস্তকে কবিতা, গানে উঠে এসেছে। প্রতিটি নদীই যেন স্বমহিমায় উজ্জ্বল। রামায়ণের উল্লেখ আছে রাম-লক্ষণ-সীতাসহ এই গোদাবরি নদীর তীরে কোনো এক গহীন জঙ্গলে বনবাস গমন করেছিল। অর্থাৎ সে গোদাবরি এখন আমাদের কাছে।

ঝিনুক ও শিফনকে জানালায় পাহারা বসিয়ে পেপার পড়তে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে ঝিনুক চিৎকার করে উঠলো, দুলাভাই, সামনে একটা বড় নদী দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীর শিহরিত হলো। সবাই জানালায় হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। দেখলাম বিরাট ফলকে লেখা, গোদাবরি। তখন ট্রেনটি সেতুর ওপর। ইংরেজি U অক্ষরের মতো সেতুটি। ট্রেনের ইঞ্জিনও দেখা যাচ্ছে আবার পেছনটিও

দেখা যাচ্ছে। সেতুটি দোতলা। উপর দিয়ে রাস্তা। বাস ট্রাক চলাচল করছে। এ রকম সেতু আছে বা থাকতে পারে, বিশেষ করে নদীর উপর দিয়ে তা আমার জানা ছিল না।

পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখি আরেকটি সেতু ঠিক হার্ডিঞ্জ বৃজের মতো। দিগন্তে কালো মেঘের আবহ, নিচে বহমান জলরাশি। কি এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। খুব নিবিড়ভাবে দেখার জন্য ওদের সঙ্গে আমিও জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে যেই ঝুকে পড়েছি তখনই ঘটনাটি ঘটলো। বুক পকেটে রাখা চশমাটি টুপ করে পড়ে লোহার বৃজে লেগে ছিটকে গোদাবরির অতলে তলিয়ে গেল। সেই বগুড়ার থানা রোডের *গোধুলী* থেকে কেনা চশমা প্রায় এক হাজার মাইল দূরে গোদাবরির অতল জলের আহ্বানে চিরতরে হারিয়ে গেল।

এবার চশমা হারানোর জন্য এতোটুকু দুঃখ হলো না। মনে হলো এ হারানোর ভেতর একটা আর্ট আছে, এ হারানোটা একটা গৌরবের ব্যাপার। চশমা হারানোর মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে হয়তো কোনোদিনই লিখতাম না। কিন্তু লিখতে আগ্রহী হলাম এই জন্য যে, এর সঙ্গে জড়িত নদী গোদাবরি। ব্যাঙ্গালোরে পৌছেই স্ত্রীকে টেলিফোনে কুশল বিনিময়ের সময় এই সুসংবাদটি দিলাম।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে

কান্না

– মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

আমি যখন খুব ছোট তখনই আমার দাদি মারা যান। এখন খুব স্পষ্ট দাদিকে মনে করতে পারি না। দাদির ব্যবহৃত বেশি কিছু জিনিস এখনো আমাদের বাসায় আছে। তার মধ্যে উল্লেখ করা মতো দাদির ব্যবহৃত চশমা।

রাত তখন প্রায় একটা। ঘুম আসছে না। অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করেও যখন ঘুম আসছে না তখন বারান্দায় গিয়ে দাড়ালাম। মনে করতে লাগলাম, গত আড়াই বছরে এমন কি কোনোদিন ছিল যেদিন ও আমার কাছে একবারের জন্য হলেও ফোন করেনি।

হঠাৎ কান্নার শব্দ কানে এলো। বাবা মায়ের ঘরে উকি দিয়ে দেখি বাবা কাদছেন। বাবার হাতে দাদির ব্যবহৃত চশমাটা। মনে পড়লো আজ যে ২২ নভেম্বর। দাদির মৃত্যু তারিখ।

টিকাটুলি, ঢাকা থেকে

পীর বংশ

– আনতিনিও অপু

এমএ পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর চাকরির জন্য দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াচ্ছি। অবশেষে একটা বেসরকারি কলেজে লেকচারার পদে চাকরি পেলাম। পিতা–মাতাসহ সকল আত্মীয়স্বজন গরু খোজার মতো পাত্রী খুজতে শুরু করলেন। আমার সহকর্মী একজনও বিষয়টি জানলো।

সহকর্মীটির সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প দিনের। পিতা বয়সী ও তাবলীগ জামায়াত বিধায় সহকর্মীটির ওপর এ অল্প দিনেই আমার অগাধ বিশ্বাস জন্মায়। তাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম।

একদিন সে আমাকে পাত্রী দেখার প্রস্তাব করে।

তার কথায় রাজি হলাম।

আমার সহকর্মী ঘটক বলে, পাত্রী দেখা যাবে দূর থেকে, তার সঙ্গে কথা বলা যাবে না। কারণ পাত্রীটি পীর বংশের। পাত্রীটির বাপ–দাদা বড় পীরের কামেল। এই বংশের মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হয় না। বিশেষ প্রয়োজনে বের হলেও চোখে চশমা লাগিয়ে, বোরখা পরে বের হয়। তাদের মুখমণ্ডল তো দূরের কথা, পায়ের পাতাও দেখা যায় না। আপনি তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী এ জন্যই সে আজ আপনাকে শুধু মুখমণ্ডল দেখাবে।

ঘটকের কথায় বিশ্বাস করলাম। কারণ তিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ না করেও বড় ধার্মিক।

এই ফাকে মেয়ের বাবা ও দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। দেখলাম আশৈশব লালিত দাড়ি। গায়ে জড়ানো বিশাল আলখাল্লা। মেয়ের দাদা জীবনের অধিকাংশ সময় কাকরাইল মসজিদে কাটিয়েছেন। নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ পড়েছে। আমার ঘটকের সঙ্গে এদের কথার অনেক মিল খুজে পেলাম। তাই সহকর্মী ঘটককে পাত্রী দেখার ব্যবস্থা করতে বললাম।

একদিন বিকেলে ফেনীর গোলাপ মিয়ার মার্কেটের তৃতীয় তলায় আমি ও ঘটক অপেক্ষা করছি পাত্রী দেখার জন্য।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটা মেয়ে তার ছোট ভাইসহ রিকশা থেকে নামছে। মেয়েটির ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল বিধায় এটাই যে সে মেয়ে তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। রিকশা থেকে নামার সময় মেয়েটি শাদা চশমার ভেতর দিয়ে এক চতুর চাহনি দিল।

ফলে মেয়েটির প্রতি আমার সন্দেহ হলো। আবার ঘটক, আমার হবু শ্বশুর ও দাদাশ্বশুরের লেবাসের কথা স্মরণ করে আমার সন্দেহের ভাবটা কেটে গেল। ভাবলাম শাদা চশমার ওপর আলো পড়ায় বুঝি এমন দেখাচ্ছিল।

মেয়েটি চশমা পরা অবস্থায় শুধু মুখটা খোলা রেখে আমাদের পাশ দিয়ে কয়েকবার হেটে গেল।

ঘটককে বললাম মেয়েটির সঙ্গে একটু কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

ঘটক বাবা চশমায় ঝলক লাগিয়ে ধমকের সুরে বললো, বলেছি না এরা পীর বংশের মেয়ে। এদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, এদের পায়ের পাতাও দেখা যায় না।

ঘটকের কথায় আর বেশি কালক্ষেপণ না করে বিয়ের আয়োজন করতে বললাম।

কিন্তু আমার বাবার কেন যেন এদের প্রতি বিশ্বাস জন্মালো না।

বাবা বিয়েতে রাজি নয় কথাটা ঘটককে জানালাম।

ঘটক বললো, যদি এ মেয়ে বিয়ে না করেন তাহলে আপনার প্রতি অভিশাপ পড়বে। কারণ এরা পীর বংশের লোক। তাছাড়া জয়নাল হাজারীর সঙ্গে এদের একটা সম্পর্ক আছে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকলাম।

ঘটক আমার এক ভগ্নিপতিকে হাত করে আমাকে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে।

পরিশেষে পিতার কথা অমান্য করে সহকর্মী ঘটকের কথাকে প্রাধান্য দিয়ে রাজি হয়ে গেলাম।

বিয়ে হলো বড় মসজিদের দোতলায়। সেই চশমা পরা মেয়েটি এই প্রথম আমার সামনে হাজির হলো। কিন্তু আজ আর তার চোখে চশমা নেই। ফলে তার কুৎসিত নাকটা ঢাকা থাকলো না।

প্রথম সাক্ষাতেই আমার নববধূকে জগদম্বার মতো মনে হচ্ছিল। মাথা নিচু করে নীরবে প্রায় এক ঘণ্টার মতো চুপ থাকলাম এবং বিয়েটাকে নিয়তির আমোঘ বিধান হিসেবে মেনে নিলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার সহকর্মী ঘটকের ঘোমটার ভেতর খেমটার নাচ ছিল।

বিয়ের পর থেকে আমার স্ত্রীকে চশমা কিংবা বোরখা পরাতে পারিনি। এমনকি মাথায় ঘোমটা দিতেও সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। ক্ষণকাল পরে দেখলাম আমার স্ত্রীর প্রতিটি কথা ও চাহনি রহস্য ঘেরা। এবং আমার শ্বশুর পরিবারের লোকজন শুধু পীর বংশেরই নয়, এরা মদ, গাজা ও হিরোইন বংশেরও।

ফেনী থেকে

১২৩

– কাজী স্বপন

২০০১

মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। মনে হচ্ছে ফ্যানের সঙ্গে মাথাও ঘুরছে। মনের মানুষকে নিয়ে দূরে কোথাও ঘুরতে যাবো, অথচ কালো চশমাটা খুজে পাচ্ছি না। হঠাৎ মনে পড়লো চশমাটা তো সুজন কক্সবাজার নিয়ে গেছে। চশমাটা যে তারই দেয়া প্রথম গিফট। সঙ্গে যদি না নিয়ে যাই তাহলে খারাপ দেখায়। পরে খবর পাঠালাম আমার কাজ আছে, অন্য একদিন যাবো। চশমার কারণে সেদিন ডেট মিস করলাম। মাঝে মধ্যে মাঝ রাতে মনে পড়ে, আজ সঙ্গী নেই। সেই চশমা এখনো সযত্নে আমার কাছে আছে।

২০০২

আমার এক বন্ধু শাহিন সাত বছর পর ইটালি থেকে এসেছে। শাহিনকে বিয়ে করানোর জন্য তার মা-বাবা উঠেপড়ে লেগেছেন। অনেক পাত্রী দেখেছে, কোনোটা পছন্দ হয়নি। আমাকেও একদিন নিয়ে গেল পাত্রী দেখতে। যথাসময়ে আমাদের সামনে পাত্রীকে আনা হলো। পাত্রী উপস্থিত হলে বন্ধু চট করে পকেট থেকে চশমা বের করে চোখে দিল।

আমার কাছে সাধারণত কোনো কিছু এড়ায় না। লক্ষ্য করলাম বন্ধুর চশমার একটা গ্লাস ফাটা। তার মধ্যে পাত্রীপক্ষ ভাববে ছেলে চোখে কম দেখে। সবার সামনে শব্দ না করে ইশারা দিয়ে বললাম, চশমাটা চোখ থেকে নামা।

আমার ইশারা না বুঝে মাথা নিচে নামালো।

আমি আবার ইশারা দিলাম মাথা সোজা করে চশমাটা হাতে রাখ।

বন্ধু ভেবেছে, পাত্রীকে টাকা দিতে হবে, এ জন্য টাকা চাচ্ছি।

কথায় আছে না, মেয়ে মানুষের কাছে গেলে অনেক পুরুষ বোকা হয়ে যায়। বন্ধুর অবস্থা হয়েছে ঠিক তাই। আর কোনো ইশারা না দিয়ে উঠে বন্ধুর কানে কানে বললাম, শালার যে চশমাটা পরেছিস সেটা ফাটা।

বন্ধু এমনই লজ্জা পেল যেন পাত্রী পক্ষ আমাদের দেখতে এসেছেন।

যাহোক, সেই পাত্রীর সঙ্গেই বিয়ে হয়েছিল। বাসর ঘরে কনে বলেছিল, *ফাটা চশমা জামাই*।

শাহিন যতোদিন দেশে ছিল আর কোনো চশমা চোখে দেয়নি।

২০০৩

এই তো কিছু দিন আগের ঘটনা। আমার চাচাকে নিয়ে গেছি চশমার দোকানে। উদ্দেশ্য চাচাকে চোখ দেখিয়ে চশমা নিয়ে দেবো। চাচা নাকি আজকাল চোখে কম দেখেন।

ডাক্তার প্রথম ফ্রেম পছন্দ করতে বললেন চাচাকে। চাচা নিজে থেকে কোনো চশমার ফ্রেম পছন্দ করতে পারলেন না।

ডাক্তার একটা ফ্রেম নিয়ে বললেন, এটা আপনাকে ভালো মানাবে। ফ্রেমটা চোখে দিয়ে চাচা বলতে লাগলেন, আমি এখন সব দেখি।

কথাটা শুনে দোকানের সবাই হেসে দেয়।

চাচা বললেন, সবাই হাসে কেন?

বললাম, চাচার যেটা পরে আছেন সেটাও খালি ফ্রেম, কাচ ছাড়া।

আমার কথা শুনে চাচা লজ্জায় দোকান থেকে বের হয়ে গেলেন।

চাচার কথাটা মনে পড়লে হাসি পায়। এই যেমন লেখার সময় হাসতে হাসতে লিখলাম।

আওলিয়াবাদ, ঢাকা থেকে

দৌড়

– মোহাম্মদ শাহরিয়ার মাহমুদ মিঠু

বাবার চাকরিতে বদলির সুবাদে আমরা সপরিবারে চলে এলাম রাজশাহীতে সেখানে এসে নতুন বাসাতে উঠলাম। কিন্তু নতুন আবহাওয়া আর নতুন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না। তার উপরে ছিল আমার চোখের সেই পুরনো সমস্যা। আমি চশমা ব্যবহার করতাম না। কারণ চশমাটা আমার কাছে একই সঙ্গে বিরক্ত ও অস্বস্তির একটা বিষয় ছিল। নতুন জায়গায় নতুনভাবে যেন চোখের সঙ্গে সঙ্গে মাথার ব্যথাটাও আরো বেড়ে গেল।

যে কাজটা কখনো পছন্দ করতাম না সেই কাজটিই আমাকে করতে হলো। মায়ের পীড়াপীড়িতে আমাকে যেতে হলো ডাক্তার অর্থাৎ চোখের ডাক্তারের কাছে। চোখের ডাক্তার মানেই চশমা আমার এ ধারণাকে আরেকবার সত্যি করে দিয়ে ডাক্তার আমার জন্য একটা চশমার বরাদ্দ দিলেন এবং চশমাটা দোকানের কাচের শেলফ ছেড়ে স্থান করে নিতে চাইলো আমার নাকের ডগার উপরে।

আমরা যে বাসায় থাকতাম তার ঠিক পাশের বাসা ছিল শরিফউদ্দীন নামের এক ভদ্রলোকের। তিনি ছিলেন বেসরকারি একটা কলেজের পৌরনীতির শিক্ষক। তবে পৌরনীতির শিক্ষক হলেও ইংরেজিটা তিনি ভালো বুঝতে পারতেন। পাশাপাশি বাসা হবার সুবাদে তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি ছাত্র হিসেবে ভালো হলেও ইংরেজিতে অনেকটা কাচা ছিলাম।

এসএসসি–তে টেনেটুনে পার হলেও ইংরেজি নিয়ে, বিশেষ করে এইচএসসিতে আমার মনের মধ্যে একটা বিশাল ভয় কাজ করতো। যেহেতু বাবার সঙ্গে তার অর্থাৎ শরিফউদ্দীন একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং যেহেতু আমরাও সেখানে নতুন, তাই বাবাকে ইংরেজিতে প্রাইভেট পড়ার কথা বলতে তিনি শরিফস্যারের কাছে পড়তে যেতে বললেন।

পাশাপাশি বাসা হলেও কখনো তার বাসায় যাইনি।

রাতে এসে বাবা জানালেন যে, শরিফস্যার আমাকে সকাল আটটায় পড়তে যেতে বলেছেন।

সকাল সাতটায় বাসা থেকে বের হয়েছি চশমাটা পকেটে নিয়ে স্যারের কাছে পড়তে যাবো বলে। নিচে নেমে দেখি বাবা দাড়িয়ে আছেন। অনাগত কিছু বিপদের আশংকা করে চশমাটা চোখে দিয়ে স্যারের বাসায় গিয়ে নক করলাম। যেহেতু নতুন চশমা পরা শুরু করেছি সেহেতু এটুকু রাস্তাতে অন্তত দশবার চোখ থেকে চশমা খুলেছি এবং পরার চেষ্টা করেছি। নক করার পরও অন্তত দুই মিনিট দাড়িয়ে আছি। মনে হলো কেউ যেন আসছে দরজা খোলার জন্য।

একটা মেয়ে এসে দরজার খুলে দিল।

মনে হলো স্যারের মেয়ে। আমি স্যার আছেন কি না জিজ্ঞাসা করতেই আমাকে বসতে বলে সে ভেতরে চলে গেল।

একটু পরে স্যার এলেন এবং পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার সমস্যাগুলো কি কি?

আমার সমস্যাগুলোর কথা তাকে বললাম।

স্যার পড়াচ্ছিলেন আর আমি আমার নাকের উপরের বস্তুটা সামলাতে ব্যস্ত। কারণ অভ্যাস না থাকলে যা হয়। মনে হচ্ছিল যেন একটা পাথর নাকের উপরে। আমি একবার চশমাটা খুলছিলাম আবার পরছিলাম। কিন্তু খুলে রাখতে পারছিলাম না। ভয় ছিল পড়তে গিয়ে যদি মাথা ব্যথাটা আবার শুরু হয়!

এমন সময় স্যারের মেয়েও বই-খাতা নিয়ে হাজির।

স্যার বললেন, আমার মেয়েও এবার তোমার সঙ্গেই ইন্টামিডিয়েট পরীক্ষা দেবে। তাই তোমার সঙ্গে সেও পড়বে।

আমার কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি ব্যস্ত চশমাটা খোলা আর পরা নিয়ে যেন একটা পরীক্ষামূলক গবেষণা চালাচ্ছি চশমাটা নিয়ে।

যাই হোক। সেদিনকার মতো পড়াশোনা শেষ করে কোনো রকমে বাড়ি চলে এলাম।

পরের দিন আবার গেলাম, দেখি মেয়েটি বই নিয়ে বসে আছে, স্যারের কথা বলতেই সে বললো, বাবা গোসল করছেন একটু পর আসবেন।

হঠাৎ করে একটু পরেই সে আমাকে বললো, আপনার কি চশমা পরতে ভালো লাগে না?

বললাম, কেন?

সে বললো, কালকে আপনাকে দেখলাম ওটার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তাই বললাম। সে আরো বললো, আপনি যাই বলুন চশমাটা সুন্দর এবং চশমাটা পরলে আপনাকে ভালো না দেখালেও অন্তত খারাপ দেখায় না।

বুঝলাম মেয়েটি কথায় খুব চটপটে। আস্তে আস্তে আমাদের পড়া গড়িয়ে চললো এবং একই সঙ্গে পড়া ও পড়শি হওয়ার সুবাদে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ হতে অবশ্য বেশি দেরি লাগলো না।

সে প্রায়ই আমার বাসায় আসতো এবং আমিও সময় পেলে তার বাসায় গিয়ে সময় কাটিয়ে আসতাম। কিন্তু কখনো ভাবতে পারিনি যে, তার সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে সে আমার মনে দাগ কাটতে শুরু করবে। ততোদিনে চশমা পরাটা প্রায় আয়ত্তে এসে গেছে।

একদিন আমার বাসায় আমার বড়আপা তার পিচ্চিকে নিয়ে হাজির। হাজার হলেও আমি তার একমাত্র মামা। কাজেই তাকে নিয়ে বসালাম আমার ঘরে। এটা-ওটা নাড়তে নাড়তে কখন চাশমাটা নিয়ে দুই টুকরো করে ফেলেছে তা দেখতেও পাইনি।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সারা রাত ঘুম হলো না। কেবল চশমাটার কথা মনে হলো। সকালে খালি চোখে পড়তে গেলাম।

মেয়েটি আমাকে চশমার কথা জিজ্ঞাসা করতেই সব তাকে খুলে বললাম এবং মিথ্যা করে তাকে বললাম যে, চশমা না থাকার কারণে মাথার যন্ত্রণায় কাল রাতে একটুকুও পড়তে পারিনি।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার চশমার পাওয়ার কতো?

বললাম, মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ।

সে আর কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। শুধু বললো, বিকেলে একটু এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

অবাধ যাতায়াতের সুযোগ থাকায় বিকেলে এসে হাজির হলাম তার বাসায়।

আমাকে দেখে সে ঘরের মধ্যে চলে গেল। অবশ্য একটু পরে ফিরেও এলো। কিন্তু দেখি আমার সেই চশমাটার মতো অবিকল একটা চশমা। চশমাটা আমার হাতে দিয়ে বললো, দেখো তো এটা ভালো লাগে কি না?

তখন আমার দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থা। জীবনে কোনো মেয়ের কাছে থেকে কিছু নিইনি বললে ভুল হবে। কোনো মেয়েই আমাকে কিছু দেয়নি। তাকে শুধু সাহস করে বললাম, তুমি আমাকে এতো ভালোবাসো?

সে আমার কথার উত্তর না দিয়ে চশমাটা আমার চোখে পরিয়ে দিয়ে সেই যে দৌড়ে পালালো, এখনো তার পেছনে দৌড়েই যাচ্ছি।

সামনের মাসের পরের মাসেই তাকে পেতে যাচ্ছি একান্ত আপন করে। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সেই চশমাটাকে তা-ই তো যত্ন করে রেখে দিয়েছি। যেমন করে তাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছি এই হৃদয়ে।

বাগাতিপাড়া, নাটোর থেকে

নির্বাচনী প্রচারণা

– শের-ই-ফারগানা মিল্টন

চার বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি। বাবার কথা মনেই পড়ে না। যেদিন বাবাকে হারালাম, বেশ খুশিতে ছিলাম আমি। সব আত্মীয়স্বজন বাড়ি আসছেন। কেমন যেন উৎসব উৎসব ভাব। সত্যিই বুঝিনি বাবাকে আর দেখতে পাবো না।

আমরা চার ভাই। আমি সবার ছোট। বড়জন রাশভারী, গম্ভীর প্রকৃতির। কেবল শাসন বুঝতেন। সেজ জন ডানপিটে, খিটখিটে স্বভাবের। সুযোগ পেলেই পিটুনি দিতেন। মেজ জন যেন দেবতা। কেবলই আদর, সোহাগ আর ভালোবাসা।

উহ! কি যে ভালো লাগতো। সারাক্ষণ মেজ ভাইয়ের গা ঘেষে থাকতাম।

মা সংসারের কাজে হিমশিম খেতেন। মনে পড়ে, মেজ ভাই সঙ্গে নিয়ে গোসল করাতেন। শুয়ে বাহুতে মাথা নিয়ে গল্প শোনাতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, গায়ের ঘামাচি টিপতেন। আরো কতো রকমের আদর-আবদার। একটু বড় হয়েই দেখলাম, আমার প্রিয় মুখ মেজ ভাইকে গ্রাম ছাড়তে হলো। তিনি মেধাবী ছাত্র থাকা সত্ত্বেও কেবল আমাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট পাস দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। ওনার সঙ্গে আমার সখ্যতা এতোটায় গভীর ছিল, বাধ্য হয়ে তিনি আমাকে না জানিয়ে চোরের মতো বিদায় নিয়েছিলেন। পরে আমার কি যে কান্না! ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম।

অনেকটা সময় গড়িয়ে যায়। নওগা থেকে ভালো রেজাল্ট নিয়ে এইচএসসি পাস করলাম। একই স্কুলে পড়ার কারণে ইতিমধ্যে পাশের গ্রামের একটি মেয়ে আমাকে ভালোবেসে ফেলে। আমিও না করতে পারি না। মেয়েটির বাবা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আমি তখন সৈয়দপুরে মেজ ভাইয়ের বাসায় থেকে বিএমএ লং কোর্সে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছি। হঠাৎ মেয়েটির চিঠি পেলাম। সামনে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। তার বাবার হয়ে কাজ করতে গ্রামে যেতে অনুরোধ করেছে। আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ঈর্ষণীয়। বাবা তিনবার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মেজ ভাইয়ের বাসায় থেকে আমার সমবয়সী ভাগ্নে পড়াশোনা করতো। নির্বাচনের সাত দিন আগে মেজ ভাবীকে বুঝিয়ে দুই মামা-ভাগ্নে গ্রামের পথে রওনা দিলাম মেজ ভাইকে না জানিয়ে। সঙ্গে নিলাম তার মনকাড়া কালো সানগ্লাস।

আমাদের কাছে পেয়ে তারা ভীষণ খুশি হলো। সারা দিন নির্বাচনী প্রচারণায় গ্রামে গ্রামে চষে বেড়াতাম। চোখে থাকতো সেই কালো রোদ চশমা। দেখতে নায়োকচিত থাকায় বেশ মানাতো বোধহয়।

আমাকে কাছে পেলেই মেয়েটি কড়া আবেগে বলতো, সানগ্লাসে তোমাকে চমৎকার মানায়। ভয় হয়, মাঝে অন্য কেউ তোমাকে ছিনিয়ে না নেয়।

মেয়েটি যতোটা রোমান্টিক ছিল, আমি ততোটা নই। স্বভাবে লাজুক বলে অন্য ছুতোয় বাড়ি ফিরতাম। নির্বাচনে আমরা জয়ী হলাম।

বিদায়বেলা মেয়েটি আমার পকেট থেকে সেই কালো সানগ্লাস তুলে নিয়ে কাদো কাদো স্বরে বললো, জানি না আবার কবে দেখা হবে, তোমার সানগ্লাসটা নিয়ে রাখলাম। সযত্নে রেখে দেবো। মন খারাপ হলে বের করে দেখবো।

ভালোবাসা, নাকি লজ্জা বুঝিনি। তবে কিছুই বলতে পারিনি। কেবল মনে মনে একটা মিথ্যা গল্প বানাতে বানাতে বিদায় নিয়েছিলাম।

মেজ ভাই প্রচণ্ড চটে গেলেন। আমার বানোয়াট গল্প তার পছন্দ হলো না। বার বার বোঝাতে চেষ্টা করলাম, নির্বাচনে জয়লাভ করার আনন্দ মিছিলের হট্টগোলে পড়ে চশমাটা ভেঙে গেছে।

তিনি রেডারে কাজ করতেন। সানগ্লাসটা ছিল অফিসের। অফিশিয়াল চশমা তাকে না জানিয়ে নেয়া এবং হারিয়ে ফেলায় তিনি ভীষণ রেগে যা-তা বলে বকা দিলেন।

ভাবী, ভাগ্নে এবং দুজন ছোট্ট ভাতিজির সামনে বকা খেয়ে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করি। রাতে এতোটুকু ঘুমুতে পারিনি। মেজ ভাইকে কতো যন্ত্রণা দিয়েছি তবু কখনো মন্দ কথা বলেননি। আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব মেজ ভাই সামান্য একটা চশমার জন্য এতোটা কষ্ট দিতে পারলেন! আমি দুঃখে, কষ্টে, যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেলাম।

পরদিন মেজ ভাই অফিসে গেলে ভাবীর প্রবল বাধা অতিক্রম করে নওগা ফিরে আসি। আর্মি অফিসারের পরীক্ষা আর দেয়া হয়নি। কারণ আমি অন্য রকম। প্রচণ্ড অভিমানী, লাজুক-ভাবুক স্বভাবের।

আজ হয়তো আর্মিতে থাকতাম। অন্য একটা চাকরি করছি। মেয়েটিও দিব্যি অন্যের ঘর করছে।

হায়রে সাধের সানগ্লাস! জানি না তুই কতোটা সযত্নে আছিস। তোর লাগি...।

হাসপাতাল রোড, নওগা থেকে

কনে দেখা

– মাহিন

আমার এক কাজিনের জন্য বহুদিন ধরে পাত্রী খোজা হচ্ছে। কিন্তু মনমতো একজনকেও পছন্দ হচ্ছে না। কারো গায়ের রঙ ফর্শা, তেমন লম্বা নয়। কেউ আবার লম্বা তো ফর্শা নয়। আমার ভাইও যে একেবারে রাজপুত্র, তাও নয়। চাওয়ার সময় তো কেউ কম চায় না! সব দিকে নিখুত হওয়া চাই।

যাহোক, ছবি দেখে একজনকে প্রাথমিকভাবে দেখতে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা হলো। এবার কে কে যাবে তা ঠিক করতে গিয়ে আমার অতি আগ্রহের জন্য এবং একমাত্র বোন হিসেবে আমাকে নেয়া হলো।

আমি এর আগে কখনো কনে দেখতে যাইনি। বাসায় কনে দেখতে যাওয়ার খানকিটা বিপক্ষে ছিলাম আমি। কিন্তু আমাকে বোঝানো হলো যে, আমরা কনে দেখতে নয়, বরং বেড়াতে যাচ্ছি এভাবে যাবো।

নির্ধারিত দিনে আমি, আমার আব্বা, বড় চাচা গেলাম কনের বাড়ি। গিয়ে দেখি সে বাড়িতে হুলুস্থুল কাণ্ড। আমাদের দেখা মাত্র মুরগি জবাই দেয়া হলো। রান্নাঘরে ব্যস্ততা বেড়ে গেল। জানি না তারা কিভাবে খবর পেলেন আমরা কনে দেখতে এসেছি।

কিছুক্ষণ পরে আব্বা আর চাচার সামনে শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে মেয়েকে আনা হলো। আব্বা, চাচা সাধারণ কিছু প্রশ্ন করলেন। পাত্রী মাটির দিকে তাকিয়েই সব প্রশ্নের জবাব দিল। আব্বা ভাবলেন মেয়েটি লজ্জা পাচ্ছে। তাই ভেতরে যেতে বললেন।

কনে ভেতরে যাওয়ার পর চাচা আমাকে কাছ থেকে মেয়েকে ভালোভাবে দেখে আসতে বললেন। ভেতরের রুমে গেলাম। গিয়ে দেখি পিয়াআপু (কনের নাম) চশমা পরে আছেন। কাচের রঙ খয়েরি ধরনের। ফর্সা মুখে বেশ সুন্দর লাগছে। হিল পরা থাকলেও খালি পায়েও তিনি বেশ লম্বা। কথা বলার সময় দাত দেখলাম। দাতও সুন্দর। দুপুরে খেয়ে আমরা বাসায় ফিরলাম। পাত্রীর সব বিবরণ দিলাম।

এরপরের ঘটনা বেশ দ্রুত ঘটলো। বাসার মুরুব্বিরা পিয়াআপুকে আংটি পরিয়ে বিয়ের তারিখ ঠিক করে এলেন। গায়ে হলুদের দিন আমরা সবাই গেলাম কনে বাড়ি। এক এক করে সবাই হলুদ দিচ্ছেন। বড় ভাবী হলুদ দিতে গিয়ে কনের থুতনি ধরে মুখটা তুলে ধরলেন। ভাবী চমকে উঠে খেয়াল করলেন, কনের বাম চোখের মনির বেশ খানিকটা শাদা। ভাবি বলে বসলেন, একি, তোমার বাম চোখে কি হয়েছে?

কনে চুপ।

পরিবেশটা ক্রমেই থমথমে হয়ে উঠলো।

অনুষ্ঠান শেষে বাসায় ফিরে সবাই আমাকে জেরা করা শুরু করলো। কেন ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম না, কেন সেদিনের খয়েরি চশমার কথা আগে বললাম না ইত্যাদি হাজারও প্রশ্ন।

নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। এমন সময় মুরুব্বি স্থানীয় একজন বলে উঠলেন, ও কি খেয়াল করবে, তার নিজের চোখও তো নষ্ট। উল্লেখ্য, আমার চশমার পাওয়ার *মাইনাস থ্* এবং আমাকে ঘুমানো ছাড়া সব সময়ই চশমা পরে থাকতে হয়।

এতো প্রশ্নের জালে জড়িয়ে কান্না আর আটকাতে পারলাম না। এই ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করলো আমার কাজিন।

ভাইয়া এসে বললেন, তাকে খামোখা বকছো কেন? মেয়েকে আমি দেখে পছন্দ করেছি আর চোখের মণি শাদা হলেও পিয়াকেই বিয়ে করবো।

কথাটা শুনে আমার মনে হলো, পায়ের নিচে যেন মাটি খুজে পেলাম। কারণ আমার অসতর্কতার জন্য এতো দূর অগ্রসর হওয়ার পর বিয়ে যদি ভেঙে যেতো তাহলে আমার আর মুখ দেখানোর জায়গা থাকতো না।

সেই ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনো নিজেকে কোনো বড় ব্যাপারে জড়াই না পাছে আমার এই চোখ দুটোকে অপরাধী করতে হয় কিংবা সানগ্লাসের আড়ালে চোখের ভাষা বুঝতে না পেরে ধোকা খেয়ে যাই!

ঈশ্বরদী, পাবনা থেকে

শিয়াল পণ্ডিত

– তটিনী

ক্লাস টেনে ওঠার পর থেকে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড মাথা ব্যথা আর চোখ ব্যথা শুরু হলো। প্রায় প্রতিদিনই ব্যথায় কষ্ট পেতাম।

একদিন আব্বুর সঙ্গে চোখের ডাক্তারের কাছে গেলাম।

তিনি চোখ পরীক্ষা করে চমকে উঠলেন এবং আমাদের ভয় পাইয়ে দিলেন। ডাক্তার আংকল যা বললেন তা হলো, আমাকে আরো অনেক আগেই ডাক্তার দেখানো উচিত ছিল। কারণ প্রথম ধাক্কাতেই -3 পাওয়ার হয়ে গিয়েছে।

যাহোক, চশমা নিয়ে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ঢুকতেই তন্ময়ভাইয়ার সামনে পড়ে গেলাম। তিনি আমাদের বাসার উপরতলায় থাকেন। কমপিউটার সায়েন্সে চান্স পেয়ে সমস্ত জগৎ উদ্ধার করে ফেলেছেন। আমাকে দেখামাত্র কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে *শিয়াল পণ্ডিত এসে গেছে* বলে প্রচণ্ড ক্ষেপাতে লাগলেন।

এমনিতেই মন খারাপ ছিল। এরপর তার কথাতে কেদে ফেললাম।

তিনি একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। ইউনিভার্সিটিতে হয়তো অনেক মজা করেন। তাই বুঝতে পারেননি যে, এতোটুকুতে আমি কেদে ফেলবো। বার বার সরি বলতে লাগলেন।

এদিকে আমার অবস্থা কেরোসিন। কান্না কিছুতেই থামাতে পারছি না। লজ্জা পেয়ে উঠে আমার রুমে চলে গেলাম। মুখ ধুয়ে এসে ড্রয়িংরুমে উকি দিয়ে দেখলাম তিনি চলে গিয়েছেন।

পরদিন স্কুলে গিয়ে *নানি, কানি, মাস্টারনী* ইত্যাদি বহু নাম পেলাম। সেদিনের ঘটনার পর আর তন্ময়ভাইয়ের সামনে যাই না। দরজা একটু ফাক করে সিড়িতে কেউ আছে কি না দেখে বের হই। এর মাঝে এসএসসি টেস্ট পরীক্ষা শেষ হলো। এখন বাসায় বসে প্রস্তুতি নিচ্ছি। মাঝে মধ্যে কোচিং করতে যাই।

সকালের দিকে তন্ময়ভাই ইউনিভার্সিটিতে যান।

একদিন সকালে আন্টির জন্য আম্মু আচার দিতে তাদের বাসায় আমাকে পাঠিয়েছেন। গিয়েই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গেলাম। কারণ ড্রয়িংরুমে তন্ময়ভাইয়া তার তিনজন বন্ধু এবং দুজন বান্ধবী নিয়ে বসে আছেন। আমি ডাইনিংরুম দিয়ে ঢুকে রান্নাঘরে আন্টিকে আচার দিয়ে চলে আসবো। এমন সময় দেখি তন্ময়ভাই ডাইনিংরুমে তার বন্ধুদের কোল্ড ড্রিংকস সার্ভ করছেন। তার সামনে না যাওয়ার জন্য ভাইয়ার রুমে ঢুকে গেলাম।

তাকে বাসায় দেখেই চশমা খুলে হাতে নিয়েছি। টেবিলে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে তার একটা গ্রুপ ছবি দেখলাম। ছবিতে তন্ময়ভাই সিড়িতে বসে আছেন আর একটা মেয়ে ওনার হাটুর ওপর হাত রেখে নিচের সিড়িতে বসে আছে। জানি না কেন বুকের ভেতর একটা ধাক্কা খেলাম। খুব দ্রুত পায়ে রুম থেকে বের হয়ে এক দৌড়ে বাসায় চলে এলাম। বাসায় এসেই মনে পড়লো চশমাটা তার ঘরে ফেলে এসেছি।

সেদিন বিকেলে ছাদে গিয়েছি। ওখানে আমাদের কিছু গোলাপের টব আছে। গাছে পানি দিচ্ছি।

এমন সময় তন্ময়ভাই পেছন থেকে নাম ধরে ডাকলেন।

মনে হলো হঠাৎ করে শরীরটা অবশ হয়ে গেল। ইচ্ছা হচ্ছিল দৌড় দিয়ে বাসায় চলে যাই।

কিন্তু দরজায় তিনি দাড়িয়ে। আমার নার্ভাসনেস দেখে মৃদু হাসলেন। একটা শক্ত মোটা খাম এগিয়ে দিলেন। চুপ করে আছি দেখে বললেন, চশমাটা তো শিয়াল পণ্ডিত আমার ঘরে ফেলে এসেছিলে। এটা অন্তত নাও।

হাত বাড়িয়ে খামটা নিয়ে ধন্যবাদ বলেই বাসায় চলে এলাম। বাসায় এসে খুব রাগ হলো নিজের ওপর। তখন কেন মাথা কাজ করছিল না? তবে কি তাকে পছন্দ করি? হাতের দিকে তাকাতে খামটা খুললাম। তাতে চশমা আর ছোট একটা চিরকুট।

চিরকুটে লেখা, *সেদিন মিষ্টি মেয়েটাকে কাদানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যদি মাফ করো তাহলে আমাকে দেখে আর লুকিয়ে থাকবে না। কষ্ট পাবো।*

এই তিনটি লাইন যে কতোবার পড়েছি তার হিসাব নেই। রাতে পড়তে বসে কিছুই পড়তে পারলাম না। এমন অস্থিরতা আগে কখনো অনুভব করিনি।

এরপর এক সপ্তাহের মতো কেটে গিয়েছে। পড়াশোনা, কোচিং এসব নিয়ে ব্যস্ত আছি।

আম্মু বললেন, বিকেল হয়েছে। একটু ছাদ থেকে ঘুরে এসো। ভালো লাগবে।

বই বন্ধ করে ছাদে যাচ্ছি। এমন সময় সিড়ি ঘরে গিয়ে দেখলাম ছাদে তন্ময়ভাই এবং তার ছবির বান্ধবী কথা বলছেন। কিছু দূরে অন্য বন্ধুরা আলাদা গল্প করছেন। ছাদে আর গেলাম না। প্রথমে একটু কষ্ট লাগলো।

তারপর নিজের মনেই হাসলাম গত সপ্তাহে তাকে নিয়ে আমার মানসিক অস্থিরতার কথা ভেবে। পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোযোগ দিলাম। দেখতে দেখতে পরীক্ষা এসে গেল। ভালো পরীক্ষা দিলাম। এবার বিস্তর অবসর।

পরীক্ষার পর মাথা ব্যথার কারণে আবার ডাক্তারের কাছে যেতে হলো। চশমার পাওয়ার আবার বেড়েছে। চশমার দোকান থেকে বের হতে গিয়ে প্রচণ্ড সুদর্শন একজন ছেলের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। ঘটনা সেখানেই থেমে যেতে পারতো। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার এক স্যারের বাসায় তার সঙ্গে পরিচয় হলো। নাম রাহি। আমি আর সে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। তবুও তার আগ্রহে বন্ধুত্ব হলো।

আমার চেয়ে প্রায় ছয় বছরের বড়। প্রচণ্ড স্পষ্টভাষী। বেশ কিছু দিন কখনো ফোনে, কখনো সামনাসামনি কথা হলো। এখন আর তন্ময়ভাইয়ের সামনে নার্ভাস হই না। তবে নিজের অজান্তেই বুকের গহীনে ব্যথা অনুভব করি। এরই মাঝে আমার এসএসসি-র রেজাল্ট দিল। প্রত্যাশার চেয়ে অনেক ভালো ফল হলো। বাসায় আত্মীয়স্বজন, সাংবাদিক, প্রতিবেশী সবাই শুভেচ্ছা জানাতে এলো। রাত নয়টার দিকে তন্ময়ভাই কতোগুলো গোলাপ নিয়ে এলেন। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে পরদিন ছাদে যেতে বললেন। যাওয়ার আগে বললেন, বিকেলে ভিড়ের মাঝে হয়তো পণ্ডিতমশাইকে দেখতেই পেতাম না। তাই এখন এলাম।

পরদিন বিকেলে ছাদে গেলাম। আজ তন্ময়ভাইয়াকেই নার্ভাস দেখলাম।

হঠাৎ বলে উঠলেন, I Love you too much. আই লাভ ইউ টু মাচ।

না। পারলাম না আজ তার ভালোবাসা গ্রহণ করতে। যদিও জানি তাকে ভালোবাসি তবুও পারিনি তার বান্ধবীর কথা ভুলতে। তাকে তার বান্ধবীর কথা বললাম।

সে বললো, বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এক বছরের মতো তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সে এখন বুঝেছে যে, সত্যিকারভাবে আমাকেই সে ভালোবাসে। তন্ময়ভাইয়ার ভালোবাসা গ্রহণ করতে না পারার পেছনে আরো একটি কারণ ছিল। তা হলো রাহি।

সেই ঘটনার পর গত তিন বছর ধরে তন্ময়ভাই হাজারবার প্রপোজ করে আসছেন। রাহির সঙ্গে আজও যোগাযাগ আছে। মনের দিক থেকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছি আমরা। তাকে অনুভব করি। আবার তন্ময়ভাই যখন ব্যাকুলভাবে বলেন তখন তাকেও অনুভব করি কিন্তু প্রকাশ করি না। আমাকে হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, অহংকারী অনেক নাম দিয়েছেন। তবে *শিয়াল পণ্ডিত* বলে আর ডাকেন না।

আজ অনেক কিছুই বুঝি। আমার বাসার মানুষ এ দুজনকে কেন জানি সেভাবে পছন্দ করে না। বুঝি বলেই পারিনি আমার প্রথম ভালো লাগাকে আপন করতে, পারিনি রাহিকে আপন করতে। কিন্তু যে চশমা থেকে এতো ঘটনা তাকে ঠিকই আপন করতে হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তাকে আমার প্রয়োজন।

ঠিকানা বিহীন

বিংশতম

– ডা. অদিতি নাযিআত

এ পর্যন্ত কম করেও বিশখানা চশমার ফ্রেম বদল করেছি। না, আমি ফ্যাশন সচেতন নেই। হারানোর অভ্যাসও আমার নেই। আমি বসে পড়ি। হ্যা, আমি চশমার ওপর বসে পড়ি। চশমাটি তখন তেড়াবেকা, চ্যাপটা অথবা মট করে ভেঙে যায়। বদলানো অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়।

বিছানা আমার খুব প্রিয়। আমি পড়াশোনা বিছানায় করতে ভালোবাসি। পড়তে বেশ গড়িয়ে নেয়া যায়। চশমা খুলে বিছানায় রাখি আর তখনই, আমাকে দোষ দেয়া যায় না। এই সমস্যা সমাধানে অনেক ব্যবস্থা নিয়ে দেখেছি। চশমার সঙ্গে চেইন লাগিয়ে চেষ্টা করেছি যেন চশমা খুললে তা গলায় ঝুলে থাকে। মন্দ নয়। সে সময়ের চশমাখানা টিকেছিল বেশ। বিপত্তি হলো অন্যত্র। আমার প্রবাসী কিছু পুচকে কাজিন বেড়াতে

এলো দেশে। প্রথম পরিচয়। ওরা ওদের বাবার কাছে জানতে চাইলো যে, আমার বয়স কেমন হবে। বৃদ্ধা নাকি।

আমি হতবাক। তখন কেবল কলেজে পড়ি। ওদের বাবা আমায় বুঝিয়ে বললেন যে, ওদের দেশে বয়স্ক মহিলারা চেইন লাগিয়ে রিডিং গ্লাস পরে।

চশমা ছেড়ে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহারের চেষ্টা করে দেখেছি। সেখানে আরো বিপদ। আমার প্রথম লেন্সটি ছিল হার্ড লেন্স। মনে পড়লে আজও রাতে দুঃস্বপ্ন দেখি। চোখের বালি মানে আসলেই চোখে বালি পড়ার অর্থ হাড়ে হাড়ে অনুভব করা যায়। এ কি আর শুধু বালি! রীতিমতো চোখের মণিতে একটি কাচের টুকরো। তখন চোখের পাতা ফেলতাম না। ফেললেই কচ কচ। আমার চোখ সারাক্ষণ ছানাবড়া হয়ে থাকতো।

এরপর সফট লেন্সের সন্ধান পাই। তাতেও সমস্যার শেষ নেই। সফট লেন্স এতোই হালকা আর নরম যে চোখে পরলে বোঝাই যায় না। কিন্তু বিপদ হলো যে, চোখে না পরলেও বোঝা যায় না। এমন হতো যে, আমি দুচোখেই লেন্স পরেছি, অথচ ঠিকমতো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আসলে চোখে পরার সময় কখন যে আঙুলের মাথা থেকে একটি লেন্স উড়ে বাতাসে হারিয়ে গিয়েছে।

লেন্স হারানো আমার জন্য ক্রনিক হয়ে দাড়ালো। আমি আবার শখ করে কালার লেন্স পরতাম। একবার এক এক কালারের পেয়ার থেকে একটি করে লেন্স হারিয়ে গেল। পরদিন ছিল একটি বিয়ের নিমন্ত্রণ। কি করি! শাড়ির সঙ্গে চশমা কেমন দেখাবে। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দুচোখে দুই কালারের বেচে যাওয়া লেন্স দুটো পরবো। চায়নিজে বিয়ে। সুতরাং আধো অন্ধকারে কেউ খেয়াল করতে পারবে না। হায়রে কপাল! বিয়ে বাড়ির ভিডিওর কথা মনে ছিল না। ভিডিওর উজ্জ্বল আলোয় রেকর্ড হয়ে থাকলো আমার দুটি চোখ একটি Light blue আরেকটি Hazel...।

আমার সর্বশেষ প্রচেষ্টা ল্যাসেক অপারেশন। লেজার রশ্মির মাধ্যমে মাত্র বিশ মিনিটের এই অপারেশনে দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। কি আনন্দ। নাকের ডগায় চশমা নেই। কন্টাক্ট লেন্স পরে চোখে পানি গড়ানো নেই। আমি আমার নিজের দুটি চোখ দিয়ে এই পৃথিবীর সব কিছু স্পষ্ট করে দেখতে পাবো।

ল্যাসেক অপারেশনের খরচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ শস্তা। তাই দেশেই করার সিদ্ধান্ত নিলাম। চোখের ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলো। আমি আলাপ করে জানতে চেয়েছিলাম যে, অপারেশনটি কতোটুকু কার্যকরী, আমার জন্য কতোটুকু উপযোগী ইত্যাদি। নিজে ডাক্তার হলেও চোখের বিশেষজ্ঞ তো নই। তা আমাকে কেমন যেন ঠেলে, বেধে, তাড়াহুড়া করে এটা টেস্ট রুমে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। এ মেশিন থেকে সে মেশিনে চোখের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো। অবশেষে জানালো যে, আমার বয়স বেশি। এ বয়সে ল্যাসেক করে দূরদৃষ্টি সমস্যা ঠিক করলে খুব তাড়াতাড়ি আবার রিডিং গ্লাসের প্রয়োজন হবে।

আমি হতাশ।

তবে কি এতোক্ষণ চোখের এতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো আমার বয়স বের করার জন্য! *চোখ যে মনের কথা বলে,* থুড়ি, মেয়েদের বয়স বলে। তা বয়স তো আর আমি গোপন করিনি। অ্যাপয়েমেন্টের শুরুতেই জানিয়েছিলাম।

অবশেষে সেই চশমাই বিংশতম সংখ্যা চোখে। আজকাল বিছানায় গড়িয়ে নেয়ার সুযোগ বড় কম। চশমা খুলে তাই টেবিল রাখি। আমার সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা বেশ ফুট-ফরমায়েশ খাটা শিখেছে। চশমা বললে টেবিল থেকে এনে দিতে পারে।

ইস্ট হ্যাম, লন্ডন থেকে